মননশীল ইসলামী মাসিক

জিজ্ঞাসা

সেপ্টেম্বর ২০১১

ঈদ সংখ্যা

- পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর নিয়ে বিশেষ নিবন্ধ
- ইসলাম ও সেক্যুলারিজম: ডা. জাকির নায়েক
- জর্ডানের নারী নেত্রী লায়লা হ্যামারনেহ-এর সাক্ষাৎকার
- আপনার জিজ্ঞাসা:জবাব দিয়েছেন

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

সম্পাদকের চিঠি

প্রিয় পাঠক

আস্‌সালামু আলাইকুম। আপনাদের সবাইকে জানাই ঈদ মোবারক। খুব দ্রুতই যেন ফুরিয়ে গেল মাহে রমজান। রমজানের পবিত্র পরিবেশে সেহরি, ইফতার, তারাবী আমাদের জীবনে নিয়ে এসেছিল আনন্দের এক ফল্গুধারা। ইবাদতে যে এত আনন্দ আছে রমজান না থাকলে মানুষ হয়তো তা উপলব্ধি করতে পারতোনা। আসলে ইসলামের যে ইবাদত তা পবিত্রতা ও আনন্দে প্রাণময়। তাই ইবাদতের গুণে মুনিনের অন্তর থাকে সজিব ও আলোকময়। প্রিয় পাঠক, আমরাতো এখন ঈদের কথা বলছি, এর আগে বলেছিলাম রোজার কথা। আমরা জেনেছি, রোজার লক্ষ্যই হলো তাকওয়া অর্জন। তাকওয়ার তাৎপর্য হলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (স.) সব আদেশ মেনে চলা ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে দূরে থাকা। আর রমজানে আমরা এ কথাও জেনেছি যে, শুধু উপবাসের নাম রোজা নয়। মিথ্যা কথা ও কাজ বর্জন না করলে শুধু উপবাসে রোজা বা সিয়াম সাধনা হয়না। যারা এই বিষয়গুলো উপলব্ধি করতে পেরেছেন এবং উপলব্ধির আলোকে আচরণকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন ঈদতো প্রকৃত অর্থে তাদের জন্যই।

প্রিয় পাঠক, ঈদে আমরা ভ্রাতৃচেতনায় উদ্বুদ্ধ হবো- ফিতরা যার এক প্রতীকী উদাহরণ। আমরাতো সবাইকে নিয়ে আনন্দ করতে চাই। কিন্তু আমাদের সমাজে তেমন আবহ এখনো সৃষ্টি হয়েছে কী? হিংসা-বিদ্বেষ ও জিঘাংসার মত বিষয়গুলো আমাদের সমাজের সম্ভাবনাকে বিকশিত হতে দেয়নি। আত্মস্বার্থ ও সংকীর্ণতার অন্ধকারকে আমাদের কথিত ঝলমলে সভ্যতা এখনো দূর করতে পারেনি। আসলে প্রযুক্তির আলো সভ্যতার অন্ধকারকে দূর করতে পারে না, এর জন্য প্রয়োজন হেরার ঐশী আলো। পবিত্র রমজানেই তো মানুষ পেয়েছিল সেই আলো। এই আলোতেই যেন আমাদের ঈদ, আমাদের জীবন উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। আবার সবাইকে ঈদ-মোবারক জানিয়ে শেষ করছি আজকের চিঠি।

ঈদ-উল-ফিতর

ড. মীর মন্‌জুর মাহ্‌মুদ

একমাস সিয়াম সাধনার পর একরাশ অনাবিল আনন্দ আর খুশির বার্তা নিয়ে শাওয়ালের নতুন চাঁদ উদিত হয়- আগমন ঘটে ঈদ-উল-ফিতরের। বছর ঘুরে এ দিনটি আমাদের মাঝে বার বার ফিরে আসে। আরবী ঈদ শব্দটি দ্বারাও বুঝায় বার বার আসা একটি দিন বা উৎসবকে। ইসলামী জীবনব্যবস্থায় ঈদকে কেবলই আনন্দ আর খুশির দিন হিসাবে বিবেচনা করা হয় না; এর রয়েছে ধর্মীয়-সামাজিক বিশেষ তাৎপর্য। মুসলমানদের জন্য এটি অত্যন্ত পুণ্যময় এবং বিশেষ ইবাদতের দিনও বটে। হাদীসের আলোকে আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাহকে রহমত হিসেবে দু'টি ঈদ দান করেছেন। আমরা জানি, ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মক্কা হতে মদিনায় আগমন করলেন তখন মদিনা বাসীদের দু'টি দিবস ছিল, যে দিবসে তারা খেলাধুলা করত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, এ দু'দিনের কি তাৎপর্য আছে? মদিনাবাসীগণ উত্তর দিলেন, আমরা জাহিলী যুগে এ দু'দিনে খেলাধুলা করতাম। তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে এ দু'দিনের পরিবর্তে এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ দু'টি দিন দান করেছেন। তা হল ঈদ-উল-আযহা ও ঈদ-উল-ফিতর' (সুনান আবু দাউদ) ‘রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এই নির্দেশনার মাধ্যমে মুসলিম সমাজে বছরের দু'টি ঈদের সূচনা হয়ে অদ্যাবধি তা দুনিয়ার প্রতিটি মুসলিম সমাজে আজও প্রতিপালিত হয়ে আসছে। মুসলিম সমাজে ধর্মীয় ভাবাবেগ আর সামাজিক সম্প্রীতির এক অপূর্ব মিলন ঘটে এ দিনে। কালপরিক্রমায় এটি আজ শ্বাশত ও মহিমান্বিতরূপ লাভ করেছে। উম্মার প্রতিটি সদস্য এদিনে আনন্দ উচ্ছাস আর পবিত্রতাবোধ যেন আপনাতেই ধারণ করে।

ঈদুল ফিতরের পরিচয় : আরবী ‘ঈদ' শব্দটি ‘আওদ' শব্দ থেকে উদ্ভূত। ঈদ অর্থ আনন্দ, খুশি, উৎসব। আর ‘আওদ' অর্থ ফিরে ফিরে আসা। ‘ফিতর' খোলা বা ভাঙ্গা। সুতরাং ঈদ-উল-ফিতর বা ফিতরের ঈদ বলতে আমরা রমাদানের এক মাস সাওম পালনের পর সাওয়াল মাসের প্রথম তারিখে সাওম ভঙ্গের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার যে উৎসব বা ঈদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ এবং নির্দেশিত পন্থায় পালন করে থাকি সেটিই ঈদ-উল-ফিতর। ফিতরের এ উৎসব মুসলমানদের কাছে প্রতিবছর ফিরে ফিরে আসে সেটিই ফিতরের ঈদ। বিশ্বে যত উৎসবের দিন ও শ্রেষ্ঠ দিন রয়েছে তার সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দিন এটি। ইসলামের এ উৎসবের দিন শুধু আনন্দ-ফুর্তির দিন নয়। বরং এ দিন আনন্দ-উৎসব এর সাথে সাথে জগৎসমূহের প্রতিপালকের ইবাদত দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়। যিনি জীবন দান করেছেন, দান করেছেন সুন্দর আকৃতি, সুস্থ শরীর, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, যার জন্য জীবন ও মরণ তাকে এ আনন্দের দিনে ভুলে থাকা হবে আর সবকিছু ঠিকঠাক মত চলবে এটা সঙ্গত নয়। তাই ইসলাম আনন্দ-উৎসবের এ দিনটিকে প্রাত্যহিক জীবনের হাসি আনন্দের পাশাপাশি আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের ইবাদত-বন্দেগি, তার প্রতি শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার নির্দেশ প্রদান করেছে।

আমাদের সমাজচিত্র : সবুজ শ্যামলে ঘেরা এ দেশটিতে অনেক পালাপার্বণ আসে। এদেশের মানুষ তা পালনও করে কমবেশী। নববর্ষ, বৈশাখি মেলাসহ নানা ধরনের উৎসব। এ সবের মধ্যে থাকে কেবল আনন্দ আর উৎসব। সামর্থ্যবানদের পরস্পর দেখাদেখি, মেলামেশা ইত্যাদি। কিন্তু পারস্পরিক দায়িত্ববোধ, সকলের অংশগ্রহণের কোন সুযোগ বা সকলকে শরীক করার কোন ব্যবস্থা নেই, নেই কোন বাধ্যবাধকতা। এ সকল কারণে এ জাতীয় উৎসব

সার্বজনিন রূপ লাভ করে না। ব্যতিক্রম কেবল দুই ঈদের ক্ষেত্রে। রমাদান শেষে পশ্চিমাকাশে সাওয়ালের একফালি নতুন চাঁদ দেখামাত্রই মুসলিম মানস যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। পরম নিষ্ঠার সাথে একমাস সিয়াম সাধনার পাশাপাশি তাদের ঈদের আনন্দ উপভোগের অপেক্ষার পালা শেষ হয়। সন্ধ্যা নেমে আসার সাথে সাথে রেডিও টিভিতে শুরু হয় আমাদের চিরচেনা প্রিয় সঙ্গীত-ও মন রমযানের ঐ রোযার শেষে, এলো খুশির ঈদ---। জাতীয় কবির কালজয়ী এ সঙ্গীতকে রোযার ঈদের আনন্দ প্রকাশের জন্য আমরা যেন মনের অজান্তেই নির্দিষ্ট করে নিয়েছি; ঈদের অনুভূতি আর এ সঙ্গীতের সূর ও ধ্বনি আমাদের হৃদয়কে বিমোহিত করে।

শিশু-কিশোররা নতুন জামা আর মজা করে ঈদগাহে যাওয়ার স্বপ্নে থাকে বিভোর, আর গৃহিনীরা থাকে সন্তান সন্ততিসহ ঈদের দিনের আতিথেয়তা নিয়ে মহাব্যস্ত। গরীব মিসকিনরা যাকাত ও সাদাকার মাধ্যমে এদিনের আনন্দে কিছুটা হলেও শরীক হতে পারে। এদিনে আমাদের দেশের দরিদ্র কৃষকের খোঁজ নিতেও ভুল করেননি জাতীয় কবি। তিনি ধনীদেরকে দায়িত্ব সচেতন করেছেন এভাবেই- জীবনে যাদের হররোজ রোযা, ক্ষুধায় আসেনি নিদ, মুমূর্ষ সেই কৃষকের ঘরে এসেছে কী আজ ঈদ?...। মানুষেরা আত্মীয় স্বজনের বাড়ী বেড়াতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয় এদিনকে সামনে নিয়ে। সারা বছর পেশাগত কারণে বাড়ীর বাইরে অবস্থানকারীরা এদিনকে উপলক্ষ্য করে শত কচ্চ উপেক্ষা করে গ্রামে বা শহরে স্বজনদের সাথে মিলিত হয়। তাদের এ ছুটে চলাকে আমরা নাড়ীর টান বলে থাকি। শহর, গ্রাম, পাড়া-মহল্লার বাড়ী-ঘর, রাস্তা-ঘাট, মসজিদ-ঈদগাহকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করাসহ নানাভাবে ঈদের সাজে সাজানো হয়। সবকিছু মিলে চারিদিকে সাজ সাজ রব পড়ে যায় ঈদ যাপনকে নিয়ে। বয়সভেদে আমাদের ঈদের আনন্দবোধ ও উপলব্ধি কাজ করে থাকে।

মানবেতিহাসে কোন সময়ই একসাথে সমাজের সকল মানুষ দারিদ্র ও জ্বরামুক্ত ছিল না। সমাজের এই অসম অবস্থান পৃথিবীর জীবনের এক চরম বাস্তবতা। এই বাস্তব অবস্থার ইসলাম সরল স্বীকৃতি দিয়ে প্রতিটি ধনীর সম্পদে গরীবের হককে সুনির্দিষ্ট ও তা পূরণ করা তাদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছে। পবিও ঈদ-উল-ফিতরের আনন্দকে নির্মল ও সার্বজনিন করার মধ্য দিয়ে ইসলামের সে সুমহান আদর্শই পালিত হয়ে থাকে। পবিত্র ঈদের দিনে মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতই আমাদের দেশের মুসলমানেরা আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই দিনটি ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর সৌহার্দ ও সপ্রীতিবোধের এক অনুপম দৃষ্টান্ত হিসাবে মুসলিম সমাজে পালিত হওয়ায় বর্তমানে এটি চিরায়ত রূপ লাভ করেছে। আমাদের সমাজেও তা কোনদিক থেকে ব্যতিক্রম নয়।

অপরদিকে রমাদানে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে তাকওয়ার গুণাবলী অর্জন, রব্বুল আলামীনের নৈকট্যলাভ আর তাঁর অপার করুণাসিক্ত হওয়ার প্রথম প্রকাশ ঘটায় এই দিনে। ফজরের নামাজের পর ঈদগাহে সমবেত হয়ে দুই রাকাত ওয়াজিব সালাত আদায় এবং সালাত শেষে ঈদগাহে পরস্পর কোলাকুলি মাধ্যমে সম্প্রীতি ও ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। সামর্থ্যের মধ্যে নতুন কাপড় পরে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী মিলে ঈদগাহে যায়, ধনী গরীব একওে ঈদগাহে উপস্থিত হয়ে এক কাতারে শামিল হয়ে এক আল্লাহর কাছে আত্মনিবেদন করে এবং সাধ্যানুযায়ী একে অন্যকে খুশিতে শামিল করে। এ সকল দৃশ্য আমাদেরকে শেখায়- ঈদ মানে আনন্দ, ঈদ মানে খুশি; ঈদ মানে মানুষে মানুষে সহমর্মী ও সমব্যথী হওয়ার এক বাস্তব প্রশিক্ষণ।

ঈদের দিনে করণীয় : হাদিস থেকে ঈদের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আমাদের কাছে সুস্পষ্ট। ইসলামী জীবনব্যবস্থার কোন নির্দেশনাই উদ্দেশ্যহীন বা কেবল সমকালীন চিন্তাপ্রসূত নয়। ঈদ সম্পর্কিত ইসলামের এ জীবনবিধানও একইভাবে বিবেচ্য। আমরা লক্ষ্য করলে দেখতে পাব, ঈদ মুসলমানদের প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি কাটিয়ে তাকে করে আনন্দঘন এবং পাস্পরিক দায়িত্বশীলতা সৃষ্টি, সকলকে সৌহার্দ ও সম্প্রীতিপূর্ণ জীবনলাভে করে ধন্য, তেমনি তাদেরকে মহান প্রতিপালকের কাছে সমবেতভাবে আত্মনিবেদনের এক অপূর্ব সুযোগ এনে দেয়, প্রেম-ভালবাসা আর দরদী সমাজ গঠন করার পথনির্দেশ প্রদান করে। এ দিনে মুসলমানদের মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, ব্যক্তিতে সমষ্টিতে, স্রষ্টা আর সৃষ্টির মাঝে দায়িত্ব ও করণীয় রয়েছে অনেক। এ পর্যায়ে সংক্ষেপে কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো-

১. ঈদের দিন সকালে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে সাধ্যমত ভাল পোশাক পরে ঈদগাহে যাওয়া। এটি মুস্তাহাব। ইবনে উমার রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত যে, তিনি ঈদুল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন। সাইদ ইবনে মুসাইয়াব (রহ) বলেন, ঈদুল ফিতরের সুন্নত তিনটি।
যথা : ঈদগাহে পায়ে হেঁটে যাওয়া, ঈদগাহের দিকে রওয়ানার পূর্বে কিছু খাওয়া, গোসল করা। এমনি ভাবে সুগন্ধি ব্যবহার ও উত্তম পোশাক পরিধান করা মুস্তাহাব।

২. ঈদ-উল-ফিতরের দিনে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে খাবার গ্রহণ করা। ঈদের সালাতের পূর্বে তিনটি, পাঁচটি অথবা সাতটি এভাবে বেজোড় সংখ্যায় খেজুর খাওয়া সুন্নাত। আমরা খেজুর সম্ভব না হলে সামান্য কিছু অন্য খাবারও খেয়ে যেতে পারি। বুরাইদা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিনে না খেয়ে বের হতেন না, আর ঈদুল আজহার দিনে ঈদের সালাতের পূর্বে খেতেন না। সালাত থেকে ফিরে এসে কুরবানির গোশত খেতেন। (মুসনাদে আহমদ)।

৩. স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যাওয়া এবং তাকবীর পাঠ করা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন ঘর থেকে বের হয়ে ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। ঈদের সালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর পাঠ করতেন। যখন সালাত শেষ হয়ে যেত তখন আর তাকবীর পাঠ করতেন না। আর কোন কোন বর্ণনায় ঈদুল আজহার ব্যাপারে একই কথা পাওয়া যায়। আরো প্রমাণিত আছে যে ইবনে উমার রা. ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহার দিনে ঈদগাহে আসা পর্যন্ত উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন।

৪. মেয়েদেরকে ঈদের সালাতে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ করে দেয়া। পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জামাতে ও জুমআর সালাতে মহিলাদের অংশগ্রহণের অনুমতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেয়েদেরকে ঈদের সালাতে অংশগ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। 'উম্মে আতিয়া রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন আমরা যেন মহিলাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহাতে সালাতের জন্য বের করে দেই...। (সহীহ মুসলিম) আমাদের দেশে এটি একটি উপেক্ষিত বিষয়। মেয়েদের সকল স্থানে যাওয়ার সুযোগ থাকলেও দীন জানার ও মানার স্থানগুলোতে যাওয়ার পথ সুগম করা আজ সময়ের দাবী।

৫. সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা।

৬. পারস্পরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করা। যেমন, তাক্বাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকা (আল্লাহ তাআলা আমাদের ও আপনার ভাল কাজগুলো কবুল করুন) (ফতহুল বারী), ঈদ মুবারক ইত্যাদির মাধ্যমে।

৭. সকল মুসলমানের জন্য দু'আ করা এবং আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশীর খোঁজ খবর নেয়া, তাদেরকে দেখতে যাওয়া।

৮. বিশেষ করে গরীব, মিসকিন ও অসহায়দেরকে সামর্থ্যের মধ্যে ঈদের খুশিতে শরীক করা।

ঈদের দিনে বর্জনীয় কাজ : ইসলামী জীবনব্যবস্থায় মানবজীবনের সকল বিষয়েই সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলার ইবাদত পালনের ক্ষেত্রে, ব্যক্তি, পরিবার ও সামাজিক জীবনের সকল দিক ও বিভাগের দায়িত্ব কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রেও রয়েছে সুনির্দিষ্ট বিধান। ঈদ উপলক্ষ্যে আনন্দ হবে অনাবিল এবং তা প্রকাশেরও মাত্রা আমাদের খেয়াল রাখা বাঞ্চনীয়। ঈদের খুশি ও আনন্দ হবে সমাজের মানুষদের অংশগ্রহণমূলক। ঈদের সকল আনন্দ ও কর্ম হবে কলুষতামুক্ত। ইসলাম আমাদেরকে সব সময়ই সুন্দর ও শৃঙ্খলাপূর্ণ জীবন যাপন করা এবং মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে শেখায়। ভোগ-বিলাস, আনন্দ-উচ্ছাস সবই হতে হবে যুক্তিপূর্ণ এবং শান্তিপূর্ণ। কোনক্রমে কোন কিছুতেই সীমালঙ্ঘন বা বাড়াবাড়ির স্থান ইসলামে নেই। আমরা আনন্দের নামে বল্গাহীন হই, অনেক ক্ষেত্রে কিছু মাত্রাতিরিক্ত কাজ করে থাকি। ফলে আমাদেরকে প্রতিবছরই অনেক রকমের দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণহানির শিকার হতে হয়। একদিকে ঈদের আনন্দ অন্যদিকে জানমালের নিরাপত্তাহীনতা দেখা দেয়। এগুলো থেকে সাবধান থাকা বাঞ্চনীয়। নিম্নে কয়েকটি বর্জনীয় বিষয় তুলে ধরা হলো-

১. আনন্দ প্রকাশের নামে অপসংস্কৃতি বা পাশ্চাত্য বা পৌত্তলিক সংস্কৃতির চর্চা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা। ঈদ ইসলাম নির্দেশিত একটি ধর্মীয় সামাজিক উৎসব। এখানে আনন্দের পাশাপাশি ইবাদত রয়েছে।
২. নতুন পোশাক পরিধানের নামে অপচয় না করা এবং অশালীন পোশাক পরিধান না করা।
৩. আনন্দ প্রকাশ করার নামে ধর্মীয় বিধানের বাইরে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা পরিহার করা আবশ্যক।
৪. আতশবাজী, পটকা ফোটানো, বাড়ী, গাড়ী, রাস্তাঘাটে অশ্লীল গানবাদ্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ না করা।
৫. ঈদের খুশি প্রকাশের জন্য পোশাক, খাদ্যগ্রহণসহ কোন কাজেই অপচয় বা অপব্যয় না করা।
৬. ঈদকে সামনে রেখে জিনিসপত্রের অতিরিক্ত মূল্য রাখা, অতিরিক্ত গাড়ীভাড়া আদায় করা ইত্যাদি জুলুমের পর্যায়ভুক্ত।
৭. বেপরোয়া গাড়ী ঘোড়া না চালানো।
৮. অধীনস্থদের দায়-দায়িত্বকে লাঘব না করা।
৯. জনমানুষের জীবনের যেকোন ধরনের নিরাপত্তাহীনতা সৃচ্চি করা।

ইসলামী জীবনব্যবস্থা নির্দেশিত ঈদ আমাদের দৈনিন্দন জীবনে অনাবিল আনন্দ লাভের সুযোগ এনে দেয়। সমাজে বসবাসরতদের মাঝে একতা, সংহতি, সাম্য-মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির এক অপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি করে। সাথে সাথে মুসলিম উম্মাহকে স্থান-কাল-পাত্রের উপরে এক দেহ এক প্রাণে পরিণত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি করে। এই দিনের শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি আদর্শ ও শান্তির আলয়ে পরিণত করার দৃঢ় প্রত্যয় যেন

আমরা গ্রহণ করতে পারি। তবেই মুসলিম উম্মাহ তার হারানো গৌরবকে ফিরে পাবে- আমরা সেই সে জাতি, সাম্য মৈত্রী এনেছি আমরা, বিশ্বে করেছি জ্ঞাতি।

চিত্তবান ঝড়ের হৃদয়

শুনুন বন্ধুরা আনন্দের অনিবার্য গান পরিতৃপ্তির গোপন হৃদয়ে
যেখানে পৌঁছে না চোখের কাতর পরশ্রী
যেখানে পূর্ণতা পেয়েছে ফাগুন রোদের কুঁড়িরা
শ্রাবণ বৃষ্টিরা ধুয়ে গেছে আমার সমুদয় স্বপ্ন
আমার চোখের স্বচ্ছতায় উদ্ভাসিত চেরির মতোন
যতট দেখার তারও অধিক প্রকাশ্য যাবতীয় গোপনের সংসারে

দেখুন এখানে বৃষ্টি হলে আকাশ স্বাধীন
নীলমুখো মেঘ জলজ জীবনে অশ্রুর আচ্ছন্নতা আনে ঠিক
আকাশের স্বাধীনতা হরণ করার সাহস কী আছে পরবাসী মেঘের
বৃষ্টিই সৃষ্টির অনিবার্য গান হয়ে জেগে থাকে মাটির বন্দরে

হয়তো বলবেন আপনি আনন্দের কোনো ভুবন পুরেছেন বুকের ভেতর
আমি বলবো– হাজার ভুবন ঘিরে আছে আমার বুকের নদীকে

শুনুন বন্ধুরা নুড়ি ডুবে থাকে জলের গভীরে
অথচ হৃদয় তার শুষ্ক-তপ্ত-দ্বগ্ধ চিরকাল
আমি তো পাথর কিংবা নুড়ি নই
আমি বিত্তবান ঝড়ের হৃদয় থেকে কুড়াই সৃষ্টির অনিবার্য গান
শিশির ঝরার শব্দে কান পাতুন
শুনুন আনন্দ ধ্বনি কিভাবে বেজে যায়
পৃথিবীর উদ্যানে

ঈদের বাঁকা চাঁদ

শরীফ আবদুল গোফরান

সময়ের আবরণে আবছায়ায় উড়ে যায়
সোনালী ডানার চিল
অনন্ত নীলের মাঝে ঘোরলাগা গোলাপ সন্ধ্যায়
মেঘের চাদর ঠেলে উঁকি দেয় ঈদের বাঁকা চাঁদ।

সাগরের তীরে তীরে ডুবে যাওয়া
লাল সূর্য তখন ডুকরে কেঁদে ওঠে

মজলুমের আহাজারীতে ককিয়ে ওঠে
কারাগারের লৌহ কপাট
মস্তকহীন মানুষের মিছিল
আগ্নেয়াস্ত্রের বিকট শব্দে মিলিয়ে যায়
আয়াত আখরাজদের করুণ আর্তনাদ।

তখন ঈদের বাঁকা চাঁদ লজ্জায় নুয়ে পড়ে
সাগরের ঢেউ আর আবেগ প্রবণ বাতাস
মর্সিয়া ক্রন্দনে কাঁপিয়ে তোলে।

আকাশের ছাদ কেটে খসে খসে ঝরে পড়া
পুঞ্জিভূত নীলের টুকরোর ফাঁকে যখন
উঁকি দেয় বাঁকা চাঁদ
তখন দুরারোগ্য যন্ত্রনায় ঈদ উৎসব
বারুদ গন্ধের মতো তেতো হয়ে যায়

অপেক্ষা শুধু একটি সোনালী ভোর
মুক্ত পরিবেশ সবুজ জমিন।

কুরআনের আলো

- আল্লাহ তাঁর নবীর প্রতি রহমত নাযিল করেন। আর আল্লাহর ফেরেশতাগণ তাঁর জন্য রহমতের দোয়া করেন। অতএব, হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ কর এবং যথাযথভাবে সালাম পেশ কর। – সূরা আল আহযাব : ৫৬

- হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর। আর তোমাদের যে সুদ লোকদের নিকট পাওনা রয়েছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা মুমিন হয়ে থাক। –সূরা আল বাকারাহ : ২৭৯

- আল্লাহ কেবল শিরকের (অংশিদারী) পাপই মাফ করেন না। এছাড়া আর যত পাপ আছে তা- যার জন্যে ইচ্ছা মাফ করে দেন। যে লোক আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে শরীক করল সে তো বড় মিথ্যা রচনা করল এবং বড় কঠিন গুনাহের কাজ করল। – সূরা আন নিসা : ৪৮

হাদীসের বাণী

- আবু সা'লাবা খুশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে আমার সব চেয়ে প্রিয় ও নিকটবর্তী হবে তারা, যাদের চরিত্র সর্বসুন্দর সর্বোত্তম। আর আমার নিকট সবচাইতে ঘৃণ্য ব্যক্তি হবে তারা, তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট চরিত্রের, যাদের মুখে কথার খৈ ফোটে, যারা মুখ বাঁকিয়ে গর্ব ও অহংকারের সাথে কথা বলে। - বায়হাকী : মেশকাত

- আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ দুঃখ-কষ্টে তোমাদের কেউ যেনো মৃত্যু কামনা না করে। হ্যাঁ চরম অবস্থায় পৌঁছে যদি তার কিছু বলতেই হয়, তবে সে যেনো বলেঃ হে আল্লাহ! আমাকে সে পর্যন্ত জীবিত রাখো যতোক্ষণ জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর হবে। আর তখন আমাকে মৃত্যু দিও, যখন মৃত্যুবরণ করা আমার জন্যে কল্যাণকর হবে। - বুখারী

- আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেনঃ কোনো ব্যক্তিকে দাওয়াত দেয়া হলে সে যদি তা কবুল না করে, তবে সে আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী করলো। আর যে বিনা দাওয়াতে প্রবেশ করলো সে চোর হয়ে প্রবেশ করলো এবং ডাকাত হয়ে বের হলো। - আবু দাউদ

ইসলাম ও সেক্যুলারিজম

ডা. জাকির আবদুল করিম নায়েক

অনুবাদ : হামিদুল ইসলাম সোহেল

PEACE TV খ্যাত ডাঃ জাকির নায়েক পেশায় একজন চিকিৎসক হলেও তিনি এখন একজন দা'য়ী বা ধর্ম প্রচারক হিসেবেই বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলোও পৃথিবীতে সাড়া জাগিয়েছে। তাঁর লেখা Islam and Secularism বইটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ সংখ্যা থেকে এর বাংলা রূপান্তর 'জিজ্ঞাসা'য় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে - **প্রধান সম্পাদক**

প্রশ্ন : মহিলারা বাইরে কাজ করতে পারবে কি? তারা কি ক্যারিয়ার গড়তে পারবে?

উত্তর : পুরুষকে যেমন উপার্জন করতেই হবে তেমনি মহিলারা কাজ করবেই এটা আবশ্যক নয়। ইসলামের একজন নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব বিয়ের আগে তার বাবা মা ভাইয়ের আর বিয়ের পরে তার স্বামীর। অর্থাৎ ইসলাম অনুযায়ী অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়। তবে কোন নারী নিজের ইচ্ছায় উপার্জন করতে চাইলে করতে পারবে। আর যদি সে বলে আমি কাজ করতে চাই না তাহলে স্বামী জোর করতে পারবে না।

ইসলাম ধর্মে নারী ও পুরুষ সমান। কিন্তু এ সমান মানে অভিন্ন নয়। কোন পুরুষ যদি চায় যে সে গর্ভধারণ করবে তা কি সম্ভব? সম্ভব নয়।

ইসলামের কিচু কাজ ফরজ, কিছু সুন্নত আর কিছু নফল। অর্থাৎ কাজের বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছে। লক্ষ্যনীয় যে, এ ক্যাটাগরি অনুযায়ী পুরুষদের ওপর নারীর ভরণপোষণের দায়িত্ব নেয়া ফরজ এছাড়া নারী পুরুষের শারীরিক ও মানসিক গঠন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার ওপর ভিত্তি করে কাজের ভিন্নতা থাকবে। এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং, নারীরা যদি প্রয়োজনে উপার্জন করতে চায়, করতে পারবে, শর্ত হল তারা হিজাব পরবে, পুরুষ ও নারীর কর্মস্থল হবে আলাদা। তারা একসাথে কাজ করবে না। প্রয়োজন হলে তারা কথা বলতে পারবে, কিন্তু প্রয়োজন ব্যতীত গল্প, গুজব, আড্ডা, হাসি-তামাশা ইত্যাদি করা যাবে না। নারী পুরুষ একসাথে কাজ করার ফল কি হয় তা সবারই জানা।

মহিলারা শিক্ষক হতে পারে, ডাক্তার হতে পারে, কাপড় বানাতে পারে, এমনকি ব্যবসায়ীও হতে পারে। তবে কর্মক্ষেত্র আলাদা হতে হবে। কিছু কিচু কাজ মহিলাদের জন্য নিষিদ্ধ। আবার কিছু কিছু কাজ পুরুষদের জন্যও নিষিদ্ধ। কিছু কাজ উভয়ের জন্যই হারাম। মহিলাদের মডেলিং করা, নাচার সুযোগ ইসলামে নেই। তেমনি পুরুষ বা নারী কারও জন্যই মদের দোকানে কাজ করা জায়েয নেই। জুয়ার আসরে কাজ করাও উভয়ের জন্য নিষিদ্ধ।

মহিলারা অবশ্যই ক্যারিয়ার গড়তে পারবে, তবে তা ইসলামী শরীয়ার মধ্যে থেকে। মহিলাদের প্রধান দায়িত্ব হল মা ও স্ত্রী হিসেবে। কিন্তু মহিলারা যদি তাদের এ দায়িত্বগুলো যথাযথভাবে পালন না করে শুধু চাকরিতে মনোনিবেশ করে তাহলে তারা তাদের ইসলাম প্রদত্ত সম্মান হারাবে। একজন মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

“মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত।”

এছাড়াও সহীহ বুখারীর বুক অব আদাব ৮নং খণ্ডের দ্বিতীয় অধ্যায়ের ২য় হাদীসে এসেছে–
“একজন লোক নবীজীকে প্রশ্ন করল, সবচেয়ে বেশি ভালবাসা কার প্রাপ্য? নবীজী সে লোকটিকে বললেন তোমার মা। লোকটি বলল, তারপর কে? নবীজী বললেন, তোমার মা। লোকটি বলল, এরপর কে? নবীজী তাকে বললেন, তোমার বাবা। অর্থাৎ চারভাগের তিনভাগ ভালোবাসা ও সাহচর্য পাবেন মা ও একভাগ পাবেন বাবা। কিন্তু যে সকল মহিলারা তাদের ক্যারিয়ারের পিছনে গুরুত্ব বেশি দিচ্ছে, তারা তাদের এ বিশাল সম্মান হারাচ্ছে। এখানে হালাল ক্যারিয়ারের কথাই বলছি! হারাম কাজ যেমন মডেলিং করার প্রশ্নই ওঠে না। যাইহোক, ইসলামী সীমার মধ্যে থেকে মহিলারা ক্যারিয়ার গড়তে পারবেন। যাতে করে জান্নাতে যাওয়া যায়।

প্রশ্ন : আমি একজন হিন্দু। আমার মতে আমরা যে যে ধর্মের অনুসারী হই না কেন, আমরা সবাই ঈশ্বরের উপাসনা করছি। আমাদের উপাসনার নিয়ম আলাদা, কিন্তু আমার মনে হয় উপাসনার নিয়মটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুরুত্বপূর্ণ হল মন থেকে উপাসনা করা। আমাদের হিন্দুধর্মের দর্শন বলছে যে কোন মানুষই মর্যাদার দিক দিয়ে উচ্চতর স্তরে যেতে পারবে, কিন্তু আপনার মতে নবী মুহাম্মদ এর উপরে কেউ যেতে পারবে না। আমি এ বিষয়ে আপনার সাথে একমত নই। এ বিষয়ে আপনারবক্তব্য কি?
উত্তর : আপনি বললেন যে, উপাসনার পদ্ধতি যাই হোক না কেন মন থেকে উপাসনা করতে হবে। কিন্তু ভাই মন থেকে করলেও ঠিক কাজ করতে হবে। কেউ যদি মন থেকে চুরি করে সেটা কি ঠিক হবে? অর্থাৎ আপনি মন থেকে পূজা করছেন ঠিক আছে, কিন্তু কার পূজা করছেন, কেন করছেন এবং কিভাবে করছেন সেটাই গুরুত্বপূর্ণ। কেউ যদি মন দিয়ে চোরের পূজা করে বা রাবণের পূজা করে কিংবা বলে আমি রাক্ষসের পূজারী, তাহলে আপনি কি মেনে নেবেন? মানার কথা নয়, আর যদি মেনেও নেন তাকে আপনি নিচু স্তরে রাখবেন, উপরের স্তরে নয়। আমরা চাই, সব মানুষই যেন উপরের স্তরে থাকে, তাই নয় কি? আর যদি একটা ভাল কাজ দুটো পদ্ধতিতে করা যায় এবং দুটোই ঠিক হয় তাহলে উভয়টিই মেনে নিতে কোন সমস্যা নেই।

এখন উপরের স্তরে পৌঁছার ব্যাপারটিতে আসা যাক। ইসলাম অনুসারে আল্লাহর পরে মর্যাদার দিক দিয়ে নবী মুহাম্মদ এর স্থান। কোন মানুষ তাঁর ওপরে যেতে পারবে না। কারণ আমরা জানি মুহাম্মদ (সা:) আল্লাহর রাসূল এবং কুরআন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মানুষের মধ্যে সবচেয়ে উপরের স্তরের হলেন নবী রাসূলগণ। এছাড়া মুহাম্মদ (সা:) এর পরে কোন নবী অথবা রাসূল আসার সম্ভাবনা নেই। কুরআনে সূরা আহযাবের ৪০ নম্বরে আয়াতে বলা হয়েছে–
অর্থ : “মুহাম্মদ তোমাদের মধ্যে কোন পুরুষের পিতা নন। তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী।”

যদি কেউ নবী মুহাম্মদ (সা:) এর পর নবুয়তের দাবি করে তার উচিত পাগলের ডাক্তার দেখানো। সুতরাং কুরআন ও হাদীসে বিশ্বাসী মানুষ মাত্রই এ বিশ্বাস রাখবে যে, কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় নবী রাসূলদের মত মর্যাদাসম্পন্ন হওয়া, তবে তাদের মত মর্যাদা লাভের জন্য যে কেউ চেষ্টা করতে পারবে। অর্থাৎ তাদের ১০০% মেনে চলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এমনকি হয়ত চেষ্টা করতে করতে কেউ কাছাকাছি পৌঁছেও যেতে পারে। কিন্তু তাদের স্তরে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

হিন্দুধর্ম অনুসারে মানুষ শুধু নবী নয়; বরং অবতারও হতে পারে তথা ঈশ্বরের স্তরে পৌঁছাতে পারে এবং এ স্তরে পৌঁছার জন্য ঈশ্বরের ভক্তি করতে হবে তথা ধ্যান করতে হবে দুনিয়াদারী বাদ দিয়ে। অন্যদিকে, ইসলাম অনুসারে দুনিয়াদারী ও ধর্মের পরীক্ষা একটা অংশ। দুনিয়াদারী বাদ দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হওয়া সম্ভব নয়; বরং সবকিছু ভারসাম্য বজায় রেখে করাই ইসলাম। ইসলাম অনুযায়ী মানুষ ঈশ্বরের স্তরে পৌঁছতে পারবে না, কারণ তিনি মানুষ নন। আর নবী-রাসূলগণ হলেন ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত মানুষ যারা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য প্রেরিত হন। এ কারণে মানুষের পক্ষে তাদের স্তরেও পৌঁছানো সম্ভব নয়।

সুতরাং এ বিষয়ে হিন্দুধর্মের সাথে ইসলাম ধর্মের পার্থক্য আছে। কিন্তু আসুন আমাদের যে পার্থক্যগুলো আছে সেগুলো ভুলে যাই আর যেগুলো আমাদের উভয় ধর্মে কমন সেগুলো পালন করার চেষ্টা করি।

আপনি মনে করেন বেদ আল্লাহর বাণী। আমি মনে করি কুরআন আল্লাহর বাণী। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিশ্বাস আলাদা। তাই এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলব। আগে যেগুলো এক সেগুলো পালন করি। অর্থাৎ যেহেতু বেদ বলছে ঈশ্বর একজন, কুরআন বলছে ঈশ্বর একজন, সুতরাং ঈশ্বর একজন। বেদ বলছে মুহাম্মদ আল্লাহর নবী হিসেবে আসবেন কুরআনও বলছে নবী, সুতরাং মুহাম্মদ আল্লাহর নবী। কুরআন বলছে মেয়েদের পর্দা করতে হবে, বেদও বলছে করতে হবে, সুতরাং মেয়েদের পর্দা করতে হবে। এবাবে যে হুকুমগুলো আপনাদের ও আমদের মধ্যে এক আসুন সেগুলো আগে পালন করি, বাকিগুলো নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে।

প্রশ্ন : একবার একজন খ্রীস্টান বন্ধুর সাথে আমার কথা হচ্ছিল কুরআন ও বাইবেল নিয়ে। সে বলল খ্রীস্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে। আর বাইবেলেও নাকি লেখা আছে কেউ যদি খারাপ কাজ করে তার সাত বংশ এর পাপের বোঝা বহন করে। আর ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো নাকি আদি পাপের সত্যতার প্রমাণ। এর উত্তরে উক্ত বন্ধুকে কি বলা যায়?

উত্তর : আপনি বাইবেলের পাপের বোঝা বহন সম্পর্কিত যে কথাটি বললেন, সেটি কোথাও লেখা আছে বলে আমার জানা নেই। তবে বাইবেলের বুক অব ইজাকেল ১৬ নং অধ্যায়ের ২০ নং অনুচ্ছেদের স্পষ্ট লেখা আছে, যে পাপ করবে সে মারা যাবে। বাবা তার ছেলের পাপের বোঝা বহন করবে না। খারাপ লোকের খারাপ কাজ তার কাছেই থাকবে। ভাল লোকের ভাল কাজও তার সঙ্গেই থাকবে। তবে খারাপ লোক তার পথটা বদলে ভাল পথে আসলে সে মারা যাবে না।

সুতরাং বাইবেল বলছে, যে পাপ করছে সে মারা যাবে অর্থাৎ পাপের জন্য পাপী ব্যক্তিই দায়ী থাকবে। কুরআনেও একই কথা আছে। কুরআন বলছে, কোন বহনকারীই অন্যের বোঝা বহন করবে না। আবার কুরআন যেমন বলছে তওবা করে ফিরে আসার কথা, বাইবেলও তেমনি বলছে কেউ খারাপ পথ থেকে ভাল পথে ফিরে এলে পুরস্কৃত হবে।

বাইবেলের কোথাও আদি পাপের কথা বলা হয়নি। এটা বাইবেলের মতবাদ নয়। এ কথাটি এনেছে চার্চ। অধিকাংশ খ্রীষ্টানদের বিশ্বাস আদম ও হাওয়া (আ:)-এর নিষিদ্ধ ফল খেতে বারণ করা হয়েছিল। হাওয়া আদম (আ:)-কে প্রলুব্ধ করলেন সেই ফল খাওয়ার জন্য। সেই পাপের বোঝাই আমরা বহন করে চলছি।

কিন্তু এ ধরনের বিশ্বাসের যৌক্তিকতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ আছে। আদম কি আমাদের কাউকে জিজ্ঞাসা করে ফল খেয়েছিলেন যে আমরা তার জন্য দায়ী থাকব? যদি আমার বাবা কাউকে খুন করেন পুলিশ কি এসে আমাকে ধরবে? যেহেতু খ্রীষ্টানরা আদি পাপে বিশ্বাস করে, তাদের উচিত তাদের দেশে এমন আইন পাস করা যে, বাবার অপরাধের জন্য ছেলেকেও শাস্তি পেতে হবে। কিন্তু তারা তা কখনই করবে না। কোন দেশেই এ ধরনের আইন হতে পারে না। কারণ তা অযৌক্তিক। সুতরাং কারও আদি পাপের জন্য তার বংশধররা দায়ী থাকবে এ ধারনা অযৌক্তিক।

একজন ডাক্তার হিসেবে আমার জানা আছে, ডায়াবেটিস একটি বংশগত রোগ। তবে ডায়াবেটিস জাতীয় বংশগত রোগগুলো আদি পাপের শাস্তি হিসেবে এসেছে এ কথা বাইবেলের কোথাও লেখা নেই। যদি এ যুক্তি সত্য ধরে নেয়া যায় যে, জেনেটিক্যালি এ রোগ পাপের বোঝা হিসেবে পরিবাহিত হচ্ছে, তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে অনেক স্মাগলার, রেপিস্টদের সন্তানরা বুদ্ধিমান ও ভাল হয়। এটা কি কারণে হয়? এক্ষেত্রে তো উল্টো তাদের আরও খারাপ হওয়ার কথা।

প্রকৃতপক্ষে ডায়াবেটিস কোন পাপের বোঝা নয়; বরং এটি একটি পরীক্ষা। আল্লাহ এই পরীক্ষা দিয়েছেন মানুষের ধৈর্য যাচাই করার জন্য। তিনি দেখতে চান যে, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তি কি ধৈর্য ধারণ করে নাকি বলে যে, আল্লাহ কেন এ রোগ দিলেন, ডায়াবেটিস কেন হল ইত্যাদি। পবিত্র কুরআনে সূরা মুলকের ২নং আয়াতে বলেছেন,

"তিনি জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টি করেছেন এ জণ্য যেন তিনি দেখে নিতে পারেন তোমাদের মধ্যে কে উত্তম আমলকারী।"

অর্থাৎ জীবন ও মৃত্যু দেয়া হয়েছে পরীক্ষা করার জন্য। এছাড়াও কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে, আল্লাহ মানুষকে পরীক্ষা করেন ভয়বীতি রোগব্যাধি ধনসম্পদের ক্ষতি দিয়ে।

সুতরাং ডায়াবেটিস কোন আদি পাপের বোঝা নয় বরং এটি পরীক্ষা। (চলবে)

যিকির ও দোয়া

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

নামায দু রাকায়াত হলে আমরা তাশাহুদ বা আত্যাহিয়্যাতুর পর ৪টি জিনিস থেকে আল্লাহর নিকট পানাহ বা আশ্রয় চাইব। সহীহ হাদিস মতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ ৪টি জিনিস থেকে অবশ্যই আল্লাহর আশ্রয় চাইতেন। বিশেষ করে সালাতের শেষ বৈঠকে। ঐ দোয়াটি হচ্ছে : আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজু বিকা মিন আযাবি জাহান্নাম ওয়া মিন আযাবিল কাবরি ওয়া আউজু বিকা মিন ফিত্নাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাত। ওয়া মিন শাররি ফিতনাতিল মাসীহিদ্দাজ্জাল। অর্থাৎ।

১। এরপর আল্লাহুম্মা সাল্লিআলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আ-লি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহীমা ওয়া আলা আ-লি ইব্রাহীম ইন্নাকা হামীদুম্মাজিদ।

২। এরপর দোয়া মাছুরা পড়তে হবে। আল্লাহুম্মা ইন্নি যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুযযুনাবা ইল্লা আন্তা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম্মিন ইন্দিকা ওয়ারহামনী ইন্নাকা আনতাল গাফুরুর রাহীম।

৩। এখানে ডানে বামে আস্সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ বলে সালাম ফিরালে সালাত শেষ হয়ে যাবে।

তবে আপনি ইচ্ছা করলে আরো একটি দোয়া সালাম ফিরাবার আগে করতে পারেন। দোয়াটি হচ্ছে : আল্লাহুম্মাগফিরলী মা কাদ্দামতু ওয়া মা আখ্খারতু ওয়ামা আসরারতু ওয়া মা আ'লানতু ওয়া মা আস্রাফতু ওয়া মা আনতা আ'লামু বিহী মিন্নী আন্তাল মুকাদ্দিমু ওয়া আনতাল মুয়াখ্খিরু। লা ইলাহা ইল্লা আনতা। অর্থাৎ হে আল্লাহ আমাকে মাফ কর। আমি যা আগে করেছি, পরে করেছি যা গোপনে করেছি যা প্রকাশ্যে করেছি, যা বাড়াবাড়ি বা সীমা লংঘন করেছি। এ ছাড়াও যা তুমি আমার চেয়ে বেশী জান সব গোনাহ মাফ করে দাও। তুমি ছাড়া কোন ইলাহ নেই।

সালাতের বৈঠকগুলোতে দু হাত হাঁটুর উপরে রাখুন (রানের উপর) দাঁড়ানো অবস্থায় সাজদার স্থানে দৃষ্টি রাখুন। ধীরস্থিরভাবে মনোযোগ সহকারে সালাত আদায় করুন। সালাতে যখন যে অংশই পড়বেন অর্থের দিকে খেয়াল করে একাগ্রচিত্ত থাকুন। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য সালাত আদায় করতে হবে। সালাতকে এমনভাবে সুন্দর করে আদায় করতে হবে যেন আল্লাহ খুশী হন। তাড়াহুড়া নয়। মনের প্রশান্তি সহকারে সালাত আদায় করতে হবে। যে সালাত আমাদের দুনিয়ার কল্যাণ ও আখেরাতের নাজাতের জন্য সহায়ক হতে পারে। তেমন সালাত আদায়ের চেষ্টা করাই বুদ্ধিমানের কাজ। মনে রাখতে হবে আল্লাহ আমাদের দেখছেন। আগামী ওয়াক্তের সালাত আমার ভাগ্যে নাও জুটতে পারে। যিকির ও দোয়া সালাতের বাইরের ও ভেতরে উভয় ক্ষেত্রেই মওজুদ আছে। সালাতের ভেতরে দোয়া করা সালাতের বাইরে দোয়া করার তুলনায় বেশী মরতবা রাখে। সালাতের ভেতরের দোয়ার গ্রহণযোগ্যতাও অনেক বেশি। ধীরস্থিরভাবে আল্লাহর ভয় সহকারে বুঝে বুঝে এবং উপলব্ধি সহকারে সকাতরে আল্লাহর সাথে কথা বলার অনুভূতি নিয়ে সালাত আদায় করুন। আল্লাহ আমাকে দেখছেন আমার কথা তিনি শুনছেন এ বিশ্বাস নিয়ে সালাত আদায় করা উচিত। এ সালাত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হলে আমাকে তিনি নাজাত দিবেন। ক্ষমা করবেন, আমার প্রতি রহম করবেন। এমন আকুতি সহকারে সালাত আদায় করতে হবে। আল্লাহ সব জানেন।

সালাত ৩ রাকায়াত হলে আত্তাহিয়্যাতুর পর আল্লাহু আকবার বলে দাঁড়িয়ে যান এবং বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম বলে সূরা ফাতিহা পড়ুন। মাগরিবের ফরজ সালাত হলে- সূরা ফাতিহার পর আর কোন সূরা বা কুরআন মাজীদের কোন অংশ পড়তে হবে না। শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়েই আল্লাহু আকবার বলতে বলতে রুকুতে চলে যান। রুকুর তাসবীহ পড়ুন আগের নিয়মে এবং রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যথারীতি সাজদায় চলে যান। ২ সাজদা আগের নিয়মে শেষ করে বসে যান। আত্তাহিয়্যাতু পড়ুন দরুদ পড়ুন দোয়া মাছুরা পড়ুন। ডানে-বামে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করুন। সালাত ৪ রাকাত হলে। যেমন যোহর, আছর বা ইশার ৪ রাকায়াত ফরজ। ৩য় রাকায়াতের সাজদা শেষ করে দাঁড়িয়ে যাবেন। ৩য় রাকায়াতের ন্যায় শুধু সূরা ফাতিহা পড়ে রুকু সাজদা শেষ করে বসুন এবং ৩ রাকায়াত সালাতের শেষ রাকায়াতের মতই আত্তাহিয়্যাতু, দরুদ ও দোয়া মাছুরা পড়ে শেষ করুন ৪ রাকায়াত সুন্নাত সালাতে প্রতি রাকায়াতেই সূরা ফাতিহার পর সূরা কেরআত মিলিয়ে পড়তে হবে। ফরজের মত শুধু সূরা ফাতিহা দিয়ে নয়। অন্যান্য সব কিছু ফরজ ওয়াজিব সুন্নাত সালাতের একই নিয়ম। পার্থক্য রয়েছে নিয়্যতে। নিয়্যত মানে নাওয়াইতুআন..... পড়া নয়। মনে মনে ইরাদা করাই যথেষ্ট। যা কিনা ১ সেকেন্ডের বেশী সময় দাবী করেনা। ফরজ সালাতের ৩য় ও ৪র্থ রাকায়াতে শুধুই সূরা ফাতিহা দিয়ে আদায় করতে হবে। সুন্নাতের প্রতি রাকায়াতে ফাতিহার পর অন্য সূরা বা কুরআনের কমপক্ষে ৩ আয়াত অথবা ছোট ৩ আয়াতের সমান ১ বা ২ আয়াত পড়তে হবে।

সব শ্রেণীর পাঠকের অবগতির জন্য সালাত আদায়ের পদ্ধতি একটু সবিস্তারে বলা হল। পাঠকের চাহিদা জানতে পারলে অর্থাৎ প্রশ্ন লিখে পাঠালে ইনশাআল্লাহ জওয়াব দেয়া হবে। লেখালেখির অভ্যাস আমার খুবই কম। দীনি ভাই বোনদের কথা ভেবে লিখছি। নিজের দায় মুক্তির আশায় লিখছি। আল্লাহর ক্ষমা আর রহমতের আশায় লিখছি। একটি পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে কিছু মানুষের একটি সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়াসের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে লিখছি।
দুনিয়া-আখেরাতের কল্যাণ ও মুক্তির আশায় লিখছি। এ প্রয়াসে যারা একত্রিত হবেন সচেষ্ট থাকবেন সকলের জন্য আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমতের কামনা করছি। যা বলছি তা করতে পারি সেজন্য আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি। এ প্রবন্ধের নিয়মিত পাঠকগণ একটি পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্য/সদস্যা হয়ে আল্লাহর রশি মজবুত করে ধারণ করব। পরস্পর বিচ্ছিন্ন হবনা ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহর রহমতের প্রতি এ আশা পোষণ করছি। যিকির ও দোয়া পরিবারের সদস্য/সদস্যাগণ আমরা একে অপরকে জানব। পরস্পর পরস্পরের সুখ-দুঃখের সহযোগী হব। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আমরা আমাদের যাবতীয় প্রচেষ্টা নিয়োজিত করব। বছরে একবার ইনশাআল্লাহ আমরা একত্রিত হব। আমরা আমাদের পরিবারের সকলকে নিয়ে জাহান্নাম থেকে বেঁচে জান্নাতের অধিবাসী হবার প্রানান্ত চেষ্টা চালাব। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় মসজিদ কাউন্সিলের মূল কাজ মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আদলে বাংলাদেশের মসজিদগুলোকে হেদায়াত জারীর কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার কাজকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। বিষয়টিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেব ইনশাআল্লাহ। এর দ্বারা আমরা দুনিয়ার কল্যাণ এবং আখেরাতের নাজাত সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া আর কিছুই আশা করবনা।
আপনি শুধু এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত ফরমটি পূরণ করে (আপনার স্বাক্ষর এবং তারিখ এর ঘরসহ) মাসিক জিজ্ঞাসার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। (চলবে)

ঈদের রূপময়তা

মাসুদ মজুমদার

মুসলমানের সর্ববৃহৎ জাতীয় উৎসব ঈদ। অন্য জাতীয় দিবসের সাথে এর তুলনা চলে না। এর কারণ জাতির মন মনন ও জীবনযাপনে ঈদের প্রভাব অপ্রতিহত ও সর্বপ্লাবী। জাতিসত্তাকে বোঝার জন্য এই বৈশিষ্ট্যটিই যথেষ্ট। জাতির সামগ্রিক চিন্তার রূপময়তাকে জীবনঘনিষ্ঠ ও প্রাণময় করে পাওয়ার এ উপমা অনেক প্রশ্নের জবাব পাইয়ে দেয়।
ঈদের প্রতিশব্দ উৎসব নয়, তবে প্রায় সমার্থক। উৎসব শব্দটির অর্থ আনন্দ প্রকাশ। উৎসব আনন্দলাভের মাধ্যমও। বলা যায়, আনন্দানুষ্ঠান-উৎসব পরিবারকেন্দ্রিক হতে পারে। সমাজকেন্দ্রিকও হতে পারে। কালের বিবর্তনে উৎসবের রূপ বদলায়। কোনোটি বিলুপ্ত হয়। আবার কোনোটি নতুন সৃষ্টি হয়। উৎসবগুলোর কোনোটিতে থাকে সমাজ-সভ্যতা ও জাতীয়তার ছাপ। কোনোটিতে সরাসরি ধরা পড়ে ধর্মের প্রাণস্পর্শী জীবনবোধ। আবার কোনোটিতে রাজনীতির ছাপও থাকতে পারে। উৎসবের পুরনো ধারায় এখন নানা বর্ণ ও বৈচিত্র্যে পূর্ণ। তবে সব অনুষ্ঠানের মূলেই রয়েছে আনন্দলাভ। কোনোটি নির্মল ইবাদতকেন্দ্রিক, কোনোটি শুধুই বস্তুতান্ত্রিক। অনেক উৎসব আছে নির্দোষ কিন্তু পালিত হয় ধর্মীয় সংস্কৃতিকে বাহন করে। প্রাচীনকালে মানুষের প্রধান পেশা ও কাজ ছিল কৃষি। কৃষির সাথে যোগ ছিল অনেক উৎসবের। সেসব নিয়ন্ত্রিত হতো চান্দ্রমাস দ্বারা। পরে জাতীয় সংস্কৃতিতে তার লোকজ আমেজের চারিত্রিক উপাদান যোগ হতে থাকে। প্রাচীনকালের কৃষিভিত্তিক উৎসবগুলো ছিল স্বতঃস্ফূর্ত, যা পরে নগরকেন্দ্রিকতা ও ভোগবাদী বিশ্বাসের কারণে স্বতঃস্ফূর্ততা হারিয়েছে, যদিও বাণিজ্যিক গুরুত্ব অনেকখানি বেড়েছে। তবে এ ধরনের নির্দোষ উৎসবগুলোতে অপসংস্কৃতির প্রভাব বেড়েছে।

উৎসবের সাথে ধর্মের যোগ থাকলেও সব উৎসব ধর্মীয় কারণে উদ্ভূত হয়নি। বিনোদনের মানবিক চাহিদা থেকেও অনেক উৎসবের উদ্ভব হয়েছিল এবং তা হয়েছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবেই। পরে সেগুলো সাধারণ উৎসবে পরিণত হয়। প্রত্যেক জাতির উৎসবে জাতিগত বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। সেখানে বিশ্বাস ও ধর্মের উপস্থিতি অনিবার্য। মুসলমানদের উৎসবগুলো জীবনঘনিষ্ঠ এবং ইবাদতকেন্দ্রিক হয়ে থাকে। ঈদউৎসব বা আনন্দ এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ঈদ-উল-ফিতরের সাথে রমজানের আত্মশুদ্ধির মাসব্যাপী রোজা পালনের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ। কারণ রোজার সাথেই ঈদের সম্পর্ক। কালে কালে বিভিন্ন অঞ্চলের লোকসংস্কৃতিও এসবের ওপর প্রভাব ফেলেছে। তাতে বদল হয়েছে ধর্মের অবিমিশ্র ও শুদ্ধ রূপেরও। যে কারণে বাংলাদেশের মুসলমানের সাথে আরব, মধ্যপ্রাচ্য ও ইন্দোনেশিয়ার মুসলমানদের ধর্মীয় জীবনচর্চা এক হলেও উৎসব অনুষ্ঠানে রকমফের দৃষ্টি এড়ায় না। এর মুখ্য কারণ, পোশাক-আশাক ও খাদ্যাভ্যাসে জাতিগত ও আবহাওয়ার প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া স্থানীয় বা লোক সংস্কৃতির জাতীয় বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে।

এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের তো বটেই, বিশ্বের মুসলমানদের প্রধান ধর্মীয় উৎসব ঈদ। রমজান শেষে ঈদুল ফিতর পালিত হয়। ঈদের গভীর অর্থবোধক দ্যোতনার সামাজিক অর্থ হতে পারে উৎসব। আর আভিধানিক অর্থ পুনরাগমন বা বারবার ফিরে আসা। অন্যান্য সামাজিক উৎসবের মতো ঈদও বারবার ফিরে আসে। এখন ঈদের সাথে লোকজ সংস্কৃতির মেলবন্ধন স্পষ্ট। ইসলাম লোকজ উৎসব ও সংস্কৃতিকে নিরুৎসাহিত করে না। বরং বিশ্বাসের গভীরতা দিয়ে আত্মস্থ করে নেয়। তবে লোকজ উৎসব উদ্‌যাপনে মানুষের জীবনের পরিসীমা ও লক্ষ্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

আদি যুগে সব উৎসব পালনে কৃষিজীবী মানুষের লোকায়ত বিশ্বাসের প্রভাব ছিল। সেই আদি যুগেও ধর্মবিশ্বাস অনুপস্থিত ছিল না। তাই লোকজ উৎসবেও পরে কিছু ধর্মীয় রীতিনীতি যুক্ত হয়। আমাদের সমাজে ও বর্তমানে ঈদ উৎসব দু'টি যতটা গুরুত্বের সাথে পালিত হচ্ছে, আগে সেভাবে হতো না। কারণ তখন ঔপনিবেশিক সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার অভাব ছিল। সেই সাথে ছিল জনগণের দারিদ্র্য এবং ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতা ও অস্পষ্টতা। আদি পর্বে নয়, ইসলামের বিচ্যুতি পর্বে লোকায়ত সমাজ-সংস্কৃতির সাথে একাকার করে সময় ও আদর্শকে আত্মস্থ করার জাতীয় মানসের অভাববোধের বিষয়টিও কম গোণ ছিল না।

মুঘল যুগে ঈদের দিন যে হইচই বা আনন্দ হতো তা মুঘল ও বনেদি পরিবারের উচ্চপদস্থ এবং ধনাঢ্য মুসলমানদের মধ্যে কিছুটা হলেও সীমাবদ্ধ ছিল। তার সাথে সাধারণ মানুষের ব্যবধান না থাকলেও কিছু দূরত্ব ছিল, যা রাসূল সা:-এর যুগে ছিল না। পরবর্তী বিজয় যুগেও ছিল না। তাই ঈদ এ দেশে জাতীয় উৎসবে রূপান্তরিত হতে সময় নিয়েছে। তবে মুঘলরা যে ঈদের গুরুত্ব দিতেন তা বোঝা যায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় খোলামেলা গণমুখী শাহি ঈদগাহের উপস্থিতি দেখে। সুফিসাধকদের ভূমিকা ছিল এ ক্ষেত্রে আলাদা, অধিকতর গণমুখী।

ঊনিশ শতকের শেষ দিকে অনেক কিছু ঈদের আনুষঙ্গিক আনন্দ হিসেবে যুক্ত হয়। এর একটি নতুন উপাদান, যা কি না লোকজ মেলা হিসেবে সমাদৃত। সে ধারা আজো কমবেশি অব্যাহত রয়েছে। বর্তমানে ঈদ উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কিছু ঈদ আনন্দ মেলার আয়োজন করা হয়। সামর্থ্যের জোড়াতালির ভেতরও ঈদবাজার এখন অনেক বেশি জমজমাট ও উৎসবমুখর। শত বছরে বাঙালি মুসলমানদের ঈদ যাপনের বিবরণে দেখা যায়, ঈদোৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বিশেষ ধরনের খাওয়া-দাওয়া। মফস্বল ও গ্রামাঞ্চলের খাবারের মধ্যে কিছু ফারাক থাকত, এখনো আছে। কোরমা-পোলাও শহরেই বেশি প্রচলন ছিল। গ্রামে ঘরে প্রস্তুত নানা রকমের পিঠা, সেমাই ও জরদার প্রচলন এখনো আছে। একসময় মেয়েরা পিঠার ওপর আঁকতেন জ্যামিতিক ধারার ছবি, লতাপাতা ও ফুল। এ ক্ষেত্রে জীবজন্তুর বা প্রাণীর ছবি সতর্কতার সাথে পরিহার করা হতো। তবে শহরে এ ধরনের লোকজ উপাদানের অভাব এখনো রয়েছে। শহরে ঈদের খাওয়ার তালিকায় প্রধান হয়ে ওঠে শাহিখানা ও ঘরে তৈরি মিষ্টান্ন। ঢাকায় ঊনিশ শতকে ঈদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল ঈদমিছিল। মাঝখানে কিছু দিন বন্ধ থাকার পর কয়েক বছর আগে থেকে আবার এ মিছিল চালু হয়েছে। পুরান ঢাকায় এ মিছিল বেশ বর্ণাঢ্য ও গণসম্পৃক্ত হয়ে উঠেছে। তবে এর সাথে ধর্মীয় আবেগ এখনো পুরোমাত্রায় যুক্ত হয়নি। উল্লেখ্য, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখ এবং দ্বীনদার মানুষ যে অনুষ্ঠানে শরিক হন না সে অনুষ্ঠান ধর্মীয় স্বীকৃতি পায় না। তবে আলেমসমাজ নেতিবাচক বক্তব্য না দিলে লোকজ উৎসব গণছোঁয়া বহু গুণ বৃদ্ধি পায়। ঈদ আনন্দ মিছিল তারই প্রমাণ।

এখন ঈদের সাথে কিছু স্থানীয় সাংস্কৃতিক উপাদান যুক্ত হয়েছে, যার বেশির ভাগ এসেছে বিভিন্ন লোকাচার থেকে। ঈদের চাঁদ দেখেই মেহেদি রাঙানোসহ নানা উৎসবে মেতে ওঠা তার মধ্যে অন্যতম। চাঁদরাতে ইবাদতের সংযম ভেঙে বাঁধনহারা আনন্দে মেতে ওঠাও নতুন সংযোজন। ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিনোদন সন্ধানও এখন নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

অনেক ক্ষেত্রে স্থানীয় বা শহুরে সংস্কৃতিও সরাসরি প্রভাব ফেলেছে ঈদোৎসবে। বিগত শতকের ত্রিশ-চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় ঈদের দিন রমনা, আরমানিটোলা বা অন্যান্য মাঠে অনুষ্ঠিত হতো নানা ধরনের খেলাধুলা। এ ছাড়া নৌকাবাইচ, ঘুড়ি ওড়ানো, ঘোড়দৌড় ইত্যাদির বিশেষ আয়োজন কম-বেশি আজো চালু আছে। বিগত শতকের শুরুতে রাজনৈতিকভাবে মুসলিম স্বাতন্ত্র্য আন্দোলন শুরু হলে ঈদোৎসব নতুন গুরুত্ব লাভ করে। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর পূর্ব বাংলা তথা বাংলাদেশে দু'টি ঈদই জাতীয় ধর্মোৎসবে রূপান্তরিত হয় এবং রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতাও পেয়ে আসছে, যা এখনো জাতীয় উৎসবের মর্যাদা পাচ্ছে। জীবনঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সাম্য-মৈত্রীর মেলবন্ধনে ঈদোৎসব এখন পর্যন্ত ধনী-দরিদ্র মিলে সর্বজনীন হয়ে আছে।

অবশ্য আর্থ-সামাজিক কারণে ঈদোৎসবের কিছু বৈশিষ্ট্য এখন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। নগরায়ন, মধ্যবিত্তের প্রসার বিভিন্ন উৎসবের বিশ্বাসগত দিক থেকে উৎসারিত আমেজে অনেক পরিবর্তন ঘটিয়েছে। তবে এখনো সাধারণ মানুষের ঈদ মানে পরিবার-পরিজনদের সাথে মিলিত হওয়া। নতুন কাপড়-চোপড় কেনা এবং ঈদের দিন যথাসাধ্য উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করা। জীবনের সুখ-দুঃখ ভাগ করে নেয়া।

অনেক সীমাবদ্ধতার পরও ঈদ দেশ ও স্থান নির্বিশেষে সব মুসলমানের প্রধান জাতীয় ও ধর্মীয় উৎসব। ঈদ ও ফিতর শব্দ দু'টিই আরবি। ঈদের অর্থ উৎসব বা আনন্দ। ফিতরের অর্থ বিদীর্ণ করা, উপবাস ভঙ্গকরণ, স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যাওয়া। পবিত্র রমজান মাসে সিয়াম সাধনা ও সংযম পালনের পর শাওয়াল মাসের ১ তারিখে সিয়াম বা রোজা ভঙ্গ করে স্বাভাবিক কর্মজীবনে ফিরে যাওয়ার আনন্দময় দিনটি ঈদুল ফিতর নামে অভিহিত। পবিত্র রমজানের নতুন চাঁদ দেখে সিয়ামের মাস শুরু হয়, শাওয়াল মাসের নতুন চাঁদ দেখে রোজা ভঙ্গ করা হয়। এই এক মাস মুসলমানরা আনুষ্ঠানিক ইবাদত ও সংযমী আচরণের মাধ্যমে সব কুপ্রবৃত্তিকে দমন করে রাখে। এ কারণে ফিতর শব্দটি মানব রিপু বা মনের ওপর বিজয় অর্থেও ব্যবহৃত হয়।

পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মে যেসব প্রধান ধর্মীয় উৎসব উদ্‌যাপিত হয়, সেগুলোর মধ্যে ঈদুল ফিতর হচ্ছে সময়ের মাপে কনিষ্ঠতম, কিন্তু আয়োজন-প্রয়োজনে ব্যাপকতর। এই সর্বজনীন ও পুণ্যময় উৎসবের উদ্‌যাপন শুরু হয় আজ থেকে ১৩৮৯ সৌর বছর আগে থেকে। ইসলামের প্রিয় নবী হজরত মুহাম্মদ সাঃ-এর মদিনাতে হিজরতের অব্যবহিত পরই ঈদুল ফিতর উৎসব পালন শুরু হয়। আরবদের ইহুদি ধ্যান-ধারণা ও জাহেলি প্রথার পরিবর্তে দুই ঈদ ছিল আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য ঘোষিত উপহার।

ইসলামি আদর্শে উজ্জীবিত আরববাসী রাসূলুল্লাহ সাঃ-এর নির্দেশে শুরু করল ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আজহা উৎসব উদ্‌যাপন। এর আগে পৌত্তলিক ভাবনায় অগ্নিপূজকদের নওরোজ এবং মূর্তিবাদীদের মিহিরজান নামে দু'টি উৎসবে মদিনাবাসী শরিক হতো। আরবরা অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ ওকাজ মেলায় আদিম উচ্ছলতায় মেতে উঠত। সেগুলো ছিল উচ্চবিত্তের খেয়ালিপনার উৎসব। এর পরিবর্তে জন্ম নিল শ্রেণীবৈষম্য-বর্জিত, পঙ্কিলতা ও অশালীনতামুক্ত ইবাদতের আমেজমাখা সুনির্মল আনন্দে ভরা ঈদ আনন্দ। আমেজের দিক থেকে প্রাণবন্ত, পবিত্র ও স্নিগ্ধ, আচরণের দিক থেকে প্রীতি ও মিলনের উৎসব ঈদুল ফিতর এখন সর্বজনীন উৎসব।

ইসলামের ধর্মীয় উৎসব হিসেবে ঈদুল ফিতরের আনুষ্ঠানিকতার দিকটি প্রধানত মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত থাকে। তবে, ইসলাম সাম্য-মৈত্রী, শান্তি-সম্প্রীতির ধর্ম ও ঈদের অর্থ আনন্দ বিধায় প্রকারান্তরে ঈদ সব মানুষের জন্যই কল্যাণ বয়ে আনে। জাতীয় জীবনে এর রূপময়তা সর্বও চোখে পড়ে। সব ক্ষেত্রে এর ইতিবাচক প্রভাব অসাধারণ

হয়ে ধরা দেয়। ভিন্ন ধর্মের মানুষও ঈদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সুফল ভোগ করে। গতানুগতিক জীবনধারার অধ্যাত্মবাদের সাথে যোগ হয় প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর ভিন্নমাত্রিক জীবনধারা।

ঈদের আর্থ-সামাজিক গুরুত্বও অপরিসীম। রোজার মাসের পথে মিলিয়ে জাকাত বর্ষ হিসাব করা এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। তা ছাড়া দান-সদকা, ফিৎরা এবং জাকাত দানের মাধ্যমে আমাদের সমাজে বিরাজমান দুষ্ট ক্ষতের মতো শ্রেণীবৈষম্য কিছুটা হলেও সহনীয় হয়। প্রচুর অর্থপ্রবাহ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রাচুর্য ধনতান্ত্রিক সমাজে সংখ্যালঘুসহ সব শ্রেণীর মানুষকে কিছুটা হলেও সুবিধাভোগী করে।

বাংলাদেশে এ দিনটি আজকাল খুবই জাঁকজমকের সাথে পালিত হয়। সবাই এ দিন সাধ্যানুযায়ী ভালো পোশাক পরে। উন্নতমানের খাবারের আয়োজন করে। আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশীরাও এ আনন্দের অংশীদার হয়। দরিদ্র ও গরিবদের ঈদের আনন্দে শরিক করা জরুরি ভাবা হয়। সকালেই ফিতরা আদায় করার চেষ্টা করে।

মুসলমানরা এ দিন কৃতজ্ঞচিত্তে খুতবাসহ ঈদের দুই রাকাত নামাজ আদায় করে। আত্মীয়স্বজনের সাথে কুশল বিনিময় করে। পদমর্যাদা কিংবা বয়স নির্বিশেষে সবাই কোলাকুলিসহ সালাম বিনিময় ও শুভেচ্ছার হাত বাড়িয়ে দেয়। আত্মীয়স্বজন ও পুণ্যবানদের কবর জিয়ারত করে। বর্তমানে ঈদকার্ড বিনিময় একটি জনপ্রিয় প্রথায় পরিণত হয়েছে। নির্দিষ্ট হারে গরিবদের ফিতরা বা শর্তহীন অনুদান বিতরণ করা ধর্মীয় দিক থেকে বাধ্যতামূলক। তা ছাড়া গরিবদের সাধ্যমতো খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদিও দান করা হয়।

বাংলাদেশের সর্বত্র ঈদ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে সাধারণত তিন দিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়। এর ফলে গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের শহরবাসী নিজ নিজ গ্রামে গিয়ে পরিবার-পরিজন ও আত্মীয়স্বজনের সাথে সম্মিলিতভাবে ঈদোৎসব পালন করতে পারে। এ সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় হযরত মুহাম্মদ সা:-এর জীবন দর্শন, ঈদের তাৎপর্য ও ইসলামের আদর্শভিত্তিক মূল্যবান প্রবন্ধাদি নিয়ে সমৃদ্ধ ঈদসংখ্যা প্রকাশিত হয়। রেডিও-টেলিভিশন বিশেষ অনুষ্ঠানমালা প্রচার করে। শহর, গ্রাম সর্বত্র ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা মহানগরীর জাতীয় ঈদগাহ ময়দান, বায়তুল মোকাররম কেন্দ্রীয় মসজিদসহ অন্যান্য মসজিদ ও ময়দানে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হয়। গ্রামাঞ্চলেও ঈদ উৎসবে সর্বত্র প্রাণ-প্রাচুর্য থাকে অপরিমেয়। সকালে ঈদের নামাজ পড়ে প্রত্যেকে ঘরে ফেরে। দিনভর এক বাড়ির লোক অন্য বাড়িতে শুভেচ্ছা বিনিময় করতে যায়। অনেকেই বিশেষ সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হয়। অতীতের ঝগড়াবিবাদ ভুলে পরস্পর পরস্পরের প্রতি মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। এ সময় গ্রামবাংলায় এক আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি হয়, যার কোনো তুলনা হয় না। তা ছাড়া আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, নাটক-নভেল, সমাজ ভাবনা এবং জীবনধর্মী সব আবেদন-নিবেদনে ঈদ এখন নিত্যপ্রসঙ্গ ও অপরিহার্য বিষয়। এটা যেন আনন্দ উপভোগের সবচেয়ে প্রভাবশালী ও প্রভাব বিস্তারকারী অনুষ্ঠান। যদিও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ঈদকে পণ্যবাজারজাত করার উৎকৃষ্ট সময়ভাবে, তারপরও এর ফলাফল ইতিবাচকই রয়ে যায়।
ঈদোৎসবের প্রভাব এখন সর্বপ্লাবী। তাই এটি জাতীয় উৎসব। সবার উৎসব। বর্ণ-গোত্র এবং ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সবার উৎসব। রোজা আত্মশুদ্ধির ইবাদত। আত্মত্যাগের ইবাদত। ইবাদতকেন্দ্রিক এমন উৎসবের নজির ঈদ ছাড়া আর কোনো উপমা মেলে না। মিলবেও না।

লেখক : বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কলামিষ্ট

সিরিয়ায় সরকারী বাহিনীর দমন অভিযানের শেষ কোথায়?

লিবিয়ায় বিদ্রোহীদের মন্ত্রিসভা বরখাস্তে নতুন মোড়

মতিন মাহমুদ

সিরিয়ায় সংস্কারের দাবীতে আন্দোলনরত বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী বাহিনীর সাম্প্রতিক দমন অভিযানে দু'শতাধিক লোক নিহত হয়েছে এবং সেখানকার পরিস্থিতি ভিন্ন মাত্রা লাভ করেছে। গত মার্চ মাস থেকে নিহত হয়েছে ১৭০০ লোক। পরিস্থিতি এতটাই নাজুক যে এরি মধ্যে সৌদি আরবসহ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রদূতদেরকে সিরিয়া থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তবে এসব সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ দমন অভিযান অব্যাহত রাখার হুমকি দিয়েছেন। এর আগে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চলতি বছরের শেষের দিকে 'অবাধ ও স্বচ্ছ' নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সিরিয়া। তা কতখানি রক্ষিত হবে সে নিয়েও রয়েছে প্রশ্ন।
অপরদিকে লিবিয়ায় বিদ্রোহী বাহিনীর সামরিক প্রধান এক হামলায় নিহত হওয়ার পর সেখানকার পরিস্থিতিও পাল্টে গেছে। বিদ্রোহীদের মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে সরকার গঠনের প্রচেষ্টা চলছে।

সিরিয়ায় অব্যাহত সামরিক হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবার ভারত, ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নিয়েছে। গত ৮ আগস্ট সৌদি আরব, কুয়েত ও বাহরাইন তাদের রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার করে নেয়। দেশটিতে গণতন্ত্রকামী সাধারণ জনগণের ওপর অব্যাহত সামরিক হামলায় উদ্বিগ্ন গোটা বিশ্ব। জাতিসংঘের বারবার অনুরোধ সত্ত্বেও সেখানে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করেনি প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদের সরকার। বাশার দাবি করেছেন, বিক্ষোভকারীরা দুস্কৃতকারী, তাদের কঠোর হাতে দমন করা সরকারের দায়িত্ব।
মানবাধিকার সংস্থাগুলো জানিয়েছে, মানবতার বিপর্যয় ঘটছে সিরিয়ায়। জাতিসংঘে ভারতীয় দূত হারদিপ সিং পুরি সাংবাদিকদের বলেন, তার দেশের মুখপাত্র দামেস্কে পৌছবেন এবং যৌথভাবে ব্রাজিল ও দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিকে সাথে নিয়ে সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে বৈঠক করবেন। এবং তারা মানবাধিকার রক্ষার আবেদন করবেন।

সিরিয়ার সীমান্তবর্তী ও সর্বাধিক বাণিজ্য সহযোগী দেশ তুরস্ক কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে। তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী এরদোগান বলেছেন, আমাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যাচ্ছে। খুব বেশিদিন আমরা এই ভয়াবহ নির্মমতার প্রতিবেশী হয়ে থাকব না। জাতিসংঘ, আরব লীগ, গালফ কাউন্সিল ও আমেরিকা বিভিন্নভাবে প্রেসিডেন্ট আসাদের এই গণহত্যা বন্ধের অনুরোধ করে আসছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আসাদ তার পন্থায় অবিচল। এর জের ধরেই রাষ্ট্রদূত প্রত্যাহার শুরু হয়েছে।

তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমাদ দাভুতোগলু দামেস্কে সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট বাশার আসাদের সাথে বৈঠক করেছেন। তিনি সিরিয়ার চলমান পরিস্থিতির বিষয়ে তুর্কি প্রধানমন্ত্রী রজব তাইয়্যেব এরদোগানের একটি বার্তা সিরীয় প্রেসিডেন্টের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিরিয়ার জন্য এক ধরনের সতর্কবার্তা নিয়ে গেছেন, যেমনিভাবে ইরাকে মার্কিন সামরিক হস্তক্ষেপের আগে তুরস্কের পক্ষ থেকে মন্ত্রী পাঠিয়ে সাদ্দামকে সতর্ক করা হয়েছিল। তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেনাবাহিনীকে

ব্যারাকে ফিরিয়ে নেয়ার জন্য সিরিয়ার প্রেসিডেন্টকে আহ্বান জানান। পাশাপাশি আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়ারও পরামর্শ দেয়া হয়। তুর্কি উপপ্রধানমন্ত্রী বুলন্দ এরিঞ্চ বলেছেন, সিরিয়ার সরকার ভুল করছে। দাভুতোগলু ফিরে আসার পর সিরিয়া পরিস্থিতির বিষয়ে তুরস্কের মন্ত্রীপরিষদ আবারো বৈঠকে বসবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

আন্তর্জাতিক চাপ সত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ জোর দিয়ে বলেছেন, 'সন্ত্রাসী' গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে তিনি তার জোর লড়াই চালিয়ে যাবেন। তার মতে, এই সহিংসতার পেছনে ওই সন্ত্রাসী গ্রুপগুলো রয়েছে। এ থেকেই বোঝা যায়, আসাদ দমন অভিযান জোরদার করছেন। সফররত তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ দাভুতোগলুকে আসাদ বলেন, 'সন্ত্রাসী গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান বন্ধ হবে না।' থেমে নেই দেশটির সেনাবাহিনীর সহিংসতাও। অতি সম্প্রতি দির আল যার শহরে সেনাবাহিনীর সহিংসতায় আবারো ১৭ জনসহ মোট ২২ অসামরিক লোক নিহত হয়েছেন। মানবাধিকার সংগঠনের বরাত দিয়ে ভারতের দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়া এ খবর দিয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন সিরিয়ান অবজারভেরটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে সর্বশেষ সেনাবাহিনীর ট্যাঙ্ক হামলায় অন্তত ১৭ জন নিহত হয়েছেন। এ দিকে আন্তর্জাতিক চাপের মুখে চলতি বচরের শেষের দিকে 'অবাধ ও স্বচ্ছ' নির্বাচন দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সিরিয়া। সিরিয়ায় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ কঠোরভাবে দমনের ওপর বিদেশী চাপ ব্যাপক বেড়েছে। সিরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াইহদ মুয়ালেম দামেস্কে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদের সাথে এক বৈঠকে বলেন, সিরিয়ায় অবাধ ও স্বচ্ছ নির্বাচন হবে। ওই নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে যে পার্লামেন্টের জন্ম হবে তাতে সিরিয়ার জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটবে। ভাস্কররা বলছেন এই প্রতিশ্রুতির বিষয়ে রয়েছে সন্দেহ। আর প্রেসিডেন্ট বাশার আল আসাদ জোর করে গণতন্ত্রকামীদের আন্দোলন কতদিন দমিয়ে রাখতে পারেন এখন সেটাই দেখার বিষয়।

লিবিয়ায় বিদ্রোহীদের মন্ত্রিসভা বরখাস্তঃ পরিস্থিতিতে নতুন মোড়

লিবিয়ায় বিদ্রোহীদের নেতা মুস্তফা আবদেল জলিল তার অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয়পরিষদের (এনটিসি) নির্বাহী কমিটি ভেঙে দিয়েছেন। এই কমিটি মন্ত্রিসভা হিসেবে কাজ করত। বিদ্রোহীদের এক মুখপাত্রের বরাত দিয়ে বিবিসি জানায়, গত মাসে বিদ্রোহীদের সামরিকপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ ইউনিস হত্যাকাণ্ডের জেরে জলিল এই পদক্ষেপ নিয়েছেন। এনটিসির সদস্য ফাতিহ তারবেল জানান, জেনারেল ইউনিসের মৃত্যুর পর পরিষদে রদবদল প্রয়োজন ছিল। বিদ্রোহ নিশ্চিত করতে এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ব প্রদর্শনেরই ইঙ্গিত এই রদবদল। তিনি বলেন, এটি সঠিক এবং এখনো এনটিসি সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ।

প্রধানমন্ত্রী মাহমুদ জিবরিলকে ইতোমধ্যে নতুন মন্ত্রীসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। পরিষদের সদস্যদের সূত্রে জানা গেছে, কোনো কোনো মন্ত্রিকে আবার নিয়োগ দেয়া হতে পারে। জেনারেল ইউনিস ফেব্রুয়ারিতে গাদ্দাফির পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দেন। ১৯৬৯ সালে যে সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গাদ্দাফি লিবিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন, সেই অভ্যুত্থানের তরুণ সেনাকর্মকর্তা হিসেবে ইউনিসও যুক্ত ছিলেন।

দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় গাদ্দাফির ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে কাজ করেছেন ইউনিস।একপর্যায়ে গাদ্দাফি প্রশাসনের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে ওঠেন তিনি। তাকে গাদ্দাফির ডান হাত হলেই সবাই জানতেন। আর এ

কারণে গাদ্দাফির পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহীদের সাথে যোগ দিলেও তাকে কিছুটা সন্দেহের চোখেই দেখা হতো বলে বিভিন্ন সূত্র জানিয়েছে। গত ২৮ জুলাই জেনারেল ইউনিসকে বিদ্রোহীদেরই একটি গোষ্ঠী হত্যা করেছে বলে ধারণা করা হলেও প্রকৃত কারণ এখনো অজ্ঞাত। দুই সহযোগীসহ তার পুড়ে যাওয়া লাশ বেনগাজির নিকটবর্তী একটি স্থানে পাওয়া যায়। তার হত্যাকাণ্ড ও বিদ্রোহীদের মন্ত্রিসভার পরিবর্তন লিবিয়ার পরিস্থিতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। রমজানের পর বোঝা যাবে পরিস্থিতি শেষ পর্যন্ত কোথায় গড়ায়।

সৌদি আরবের দাম্মাম শহরের আল-হাম্মাদী মসজিদে জুমার খুতবা

বিষয়: তাক্বওয়া অর্জন ও দীনের উপর অটল থাকার ওপর গুরুত্বারোপ

খতীব : মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হউক মানবতার মহান নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর পরিবার পরিজন ও সাহাবীদের উপর।

সম্মানিত উপস্থিত!

মহান আল্লাহকে যথার্থভাবে ভয় করে জীবন অতিবাহিত করুন এবং পবিত্র রমযানে সুস্থ অবস্থায় সুষ্ঠুভাবে ইবাদাত বন্দেগীতে কাটানোর তাওফিক প্রদানের জন্য তাঁর নিকট শুকরিয়া জ্ঞাপন করুন। আমরা আমাদের রবের জন্যই প্রশংসা করছি যিনি দয়া করে আমাদের ইবাদাত করার সুযোগ করে দিয়েছেন ও তাঁর রহমতের বিনিময়েই আমাদের তিঁনি পবিত্র জীবন যাপন করার তাওফিক দিয়েছেন। আমরা তাঁর নিকট আমাদের ছোটখাট আমলগুলো কবুল করার, গুনাহরাশি ক্ষমা করার ও আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করার আকুতি জানাই।

আল্লাহর বান্দাগণ!

আজ আপনারা এমন এক দিবসে উপনীত হয়েছেন চন্দ্র-সূর্য্য থেকে শুরু করে পৃথিবীর সবকিছুই আপনাদের আনন্দের সাথে অংশ নিয়েছে। আপনারা একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের নিমিত্তেই দিবসে রোজাব্রত পালন করেছেন, বিভিন্ন প্রকার নফল ইবাদাতের মাধ্যমে রাতের কিছু অংশ জেগেছেন। আর আজ সেই মহান আল্লাহ আপনাদের ইসলাম নামক যে পরিপূর্ণ জীবন বিধান দ্বারা ধন্য করেছেন তার শুকরিয়া আদায় করতে অত্যন্ত প্রফুল্ল মনে তাকবির ধ্বনির মাধ্যমে ঈদের জামাতে হাজির হয়েছেন। প্রত্যেকে তার আমলগুলো কবুল হওয়ার জন্য মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে অনুনয় বিনয় করুন।

আজকের এই আনন্দঘন মহান দিবসে আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাচ্ছি ও মুমীনের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত যেন এমন সুখময় হোক সেই কামনা করছি।

মুমিন বন্ধুগণ!

ঈদের দিন ঘনিয়ে এলে পৃথিবী নতুন এক সাজে সজ্জিত হতে থাকে। প্রতিটি বস্তুতে প্রাণের শিহরণ জাগরিত হতে দেখা যায়। এগুলো মূলত মিল্লাতে মুসলিমার সাথে প্রকৃতির এক অমোঘ সম্মিলনের বহিঃপ্রকাশ। মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন যখন মুমিনের আমলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে খুশী হন তখন মুমিনের এ থেকে আনন্দের আর কি হতে পারে? আর এ আনন্দে অংশগ্রহণ করে থাকে ধনী-গরীব নির্বিশেষে আপামর জনতা। ধনীরা যখন গরীবদের জন্য সাহায্যের হাত বৃদ্ধি করে থাকে তখন সে পরিবেশে ভ্রাতৃত্ব ও সৌহার্দের এক অনুপম ভাবধারা বিরাজ করে আর তাতে মনে হয় জান্নাতী পরিবেশের কিঞ্চিত নমুনা। হিংসা-বিদ্বেষ বিদুরিত হয়ে তখন সৃষ্টি হয় ভালবাসার ফাল্গুধারা।

পবিত্র রমযানের ঈদে যখন মুমিনগণ পরস্পর মুসাফিহা, কোলাকুলি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করে তখন তাদের মধ্যে জমে থাকা ছোটখাট ভুল বুঝাবুঝি বিদুরিত হয়ে যায়। অন্য সময় কোন কারণে চেহারায় মলিনতা থাকলেও ঈদের পবিত্র দিনে সবার চেহারাতে ফুটে উঠে হাস্যজ্জোল এক নুরানী বহি:প্রকাশ। যেন ঈদের বদৌলতে মনের সব কালিমা দূর করে ঈমানী শক্তিতে বলিয়ান হয়ে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করতে থাকে।

ঈদ এমন এক মাধ্যমে যার ফলে মানুষের মনে জমে থাকা পারস্পরিক মনোমালিন্য দূর করে ভাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটায়। তাই আমরা এই সুযোগটিকে কাজে ব্যবহার করত নিকটাত্মীয়, বন্ধুবান্ধব ও পড়শীদের মাঝে একে অপরকে পরিত্যাগ করার যে প্রবণতা সৃষ্টি হয় তা দূর করার এক সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আমাদের প্রিয় নবীর একটি সুন্দর বাণী এ দিকটির প্রতি সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে। তিঁনি ইরশাদ করেন:

“কোন মানুষের মধ্যে ক্ষমা করার প্রবণতা থাকলে আল্লাহ তার মর্যদা বৃদ্ধি করে থাকেন।” (মুসলিম শরীফ) তিঁনি আরো ইরশাদ করেন:

“কোন মুসলিমের জন্য এটি বৈধ নয় যে, সে তার অন্য মুসলিম ভাইকে তিন দিন এড়িয়ে যাবে ও তার সাথে সম্পর্ক রাখবে না। বরং তাদের মাঝে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে সালামের মাধ্যমে অন্যকে আপন করে নেয়।” (বুখারী শরীফ)

আবু দাউদ শরীফের অন্য একটি হাদীস ব্যাপারটির ভয়াবহতা তুলে ধরে ইঙ্গিত প্রদান করেছে। ইরশাদ হচ্ছে:

“মুমিন মুসলিমদের কেউ অন্যের সাথে সম্পর্ক তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন করা অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।” এ প্রসঙ্গে অন্য আরো হাদীস রয়েছে যা আমাদের আঁতকিয়ে তুলতে সক্ষম। প্রিয় নবী ইরশাদ করেন:

“কোন মুমিন যদি তার অপর মুমিনের সাথে সম্পর্ক এক বছর কাল ছিন্ন রাখে সে যেন এমন পাপ কাজে জাড়াল যাতে তার মৃত্যু দণ্ড দেয়া যায়।” (আবু দাউদ শরীফ)

নবীজির উপরোক্ত হাদীসগুলোর শিক্ষা আমাদের মধ্যে বাস্তবায়ন অত্যাবশ্যক। তাই আমাদের পারস্পরিক সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠে শয়তানের কুমন্ত্রণাগুলো থেকে নিজেদের বিরত রাখা অত্যাবশ্যক।

আল্লাহর বান্দাগণ!

গভীরভাবে লক্ষ্য রাখুন মহান আল্লাহর অসন্তুষ্টির অন্যতম ও জঘন্যতম কারণ হল ছেলে সন্তানদের তাদের পিতামাতা বা তাদের যে কোন একজনের নাফরমাণী করা বা অবাধ্য হওয়া। এ বিষয়টি মহা দৃতা হিসেবে বিবেচিত। পবিত্র কুরআনে ব্যাপারটিকে লা'নত বা আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়ার মত অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করে থাকে।

“ক্ষমতা লাভ করলে সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ অভিস্নাত করেন, অত:পর তাদেরকে বধির ও দৃষ্টিশক্তিহীন করেন।” (সূরা মুহাম্মাদ, ২২-২৩) পিতামাতা থেকে নিকটাত্মীয় আর কে হতে পারে?

হে পিতামাতার অবাধ্য সন্তানগণ!

সাবধান থাকবে ও মনে রাখবে পিতামাতার সন্তুষ্টিতে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও তাদের অবাধ্যতা মহান আল্লাহর অবাধ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। মহান আল্লাহ তাঁর ইবাদাতের নির্দেশের সাথে সাথে পিতামাতার প্রতি সহানুভূতিশীল ও তাদের আনুগত্য করতে নির্দেশ প্রদান করেছেন। এ ব্যাপারে অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা আবশ্যক ও তাদের অবাধ্যতা থেকে সম্পূর্ণভাবে দূরে অবস্থান দরকার। পিতামাতার অবাধ্যতা বলতে মূলত বাঝায় তাদের সাথে উচ্চস্বরে ও অযাচিত কথা বলা, তাদের প্রতি চোখ রাঙিয়ে দেখা, সামর্থ্য থাকা অবস্থায়ও তাদের প্রয়োজনীয়তা পূরণ না করা যা তাদের সম্মানবোধের হানি ঘটায়। আমাদের মাঝে কেউ এমন দুষ্কর্ম করে থাকলে আজই পিতামাতার সন্তুষ্টি অর্জনে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, তাদের সুস্থতার জন্য দুয়া করবে। খুব শীঘ্র দেখতে পাবেন আপনার জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসবে ইনশাল্লাহ।

ঈদগাহে আগত সম্মানিত মুমিনগণ!

আপনার সমাজের হতদরিদ্রদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন না। তারা আমাদেরই ভাই। তাদের মনে আনন্দ সৃষ্টি হয় সে ব্যবস্থা আপনাদের নিতে হবে। এটি মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের অন্যতম বাহন। আপনাদের অনুষ্ঠানাদিতে তাদের দাওয়াত দিন। মনে রাখবেন ঐ দাওয়াত অনুষ্ঠানই শ্রেষ্ঠ যেখানে দরিদ্রদের আমন্ত্রণ করা হয়। আর যে অনুষ্ঠানে তাদের পরিহার করা হয় সেটি কোন ভাল অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয় না। মহান আল্লাহ আপনাদের যে নিয়ামত প্রদানে ধন্য করেছেন তা থেকে তাদের কিছু দিন। মনে রাখবেন, আপনাদের বিলাস ব্যাসনের অনেক খরচ থেকে কিছুটা তাদের আবশ্যক ও জীবন বাঁচানোর জন্য দান করুন। অনেক দরীদ্র তো এমন আছে যারা মান সম্মানের খাতির চাইতে পারে না। তাদের কারো কারো বুকফাটা কান্না আপনাদের কর্ণকুহরে পৌঁছে না। সমাজের এ প্রকারের ব্যক্তিদের একটু খবর নিন। তাদের প্রতি হস্ত সম্প্রসারিত করা আপনাদের প্রতি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে রিযক বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে।

ওহে সম্মানিত ঈদগাহের উপস্থিত!

বিভিন্ন অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন। তাদেরও আপনাদের ঈদের আনন্দঘন পরিবেশে অন্তর্ভূক্ত করুন। সম্ভব হলে তাদের সাথে সাক্ষাৎ করুন। মনে রাখবেন ঈদের আনন্দ যেন শুধুমাও সুস্থদের মাঝে সীমাবদ্ধ না থাকে, বরং অসুস্থদের ও তাতে অংশ রয়েছে। তাদের সাথে সাক্ষাৎ করুন, খোঁজ খবর নিন, তাদের ঈদের শুভেচ্ছা জানান ও ধৈর্য্যের পরামর্শ দিন। তারা আপনাদের এ বদান্যতায় আকৃষ্ট হবে। আল্লাহ তায়ালা ঐসমস্ত রোগ থেকে যে আপনাদের সুস্থ রেখেছেন তার জন্য তাঁর প্রশংসা করুন।

আল্লাহর বান্দাগণ!

দীন ও ভ্রাতৃত্বের দাবীর মধ্যে আরও একটি অন্যতম দিক হলো আমাদের দেশে বিভিন্ন মুসলিম দেশের প্রতিনিধিগণ যারা এসেছেন তাদের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখা। তারা অনেকেই তাদের কলিজার টুকরো ছেলে-সন্তান ও নিকটাত্মীয়দের ছেড়ে আমাদের এখানে অবস্থান করছেন নিজেদের দারিদ্রতার কষাঘাত থেকে মুক্ত করার জন্য। তাদেরও আমাদের আনন্দঘন পরিবেশে অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ও দাওয়াতে শরীক করতে হবে।

আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। (আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তিঁনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তাঁরই জন্য সর্ব প্রকার প্রশংসা)।

ইসলামী উম্মাহর সদস্যগণ!

আজ আমাদের একটি বিষয় সবারই ঐক্যবদ্ধভাবে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, আমাদের মধ্যে ঐক্যের ব্যাপারে কোন প্রকার দ্বিমত পোষণ করা চলবে না। আমাদের নেতৃবৃন্দকে আমাদের নিরাপত্তা, কল্যাণের বিরুদ্ধে যারা অবস্থান করছে তাদের বিরুদ্ধে সহযোগীতা করা ও তাদের পাশে থাকা। দীন ও আক্কীদার সংরক্ষণে আমাদের সবার সীশাঢালা পাথরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। আমাদের দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা দেখে আমাদের ও ইসলামের শত্রুরা হিংসায় মরছে। আল্লাহর রহমত থাকলে ও আমাদের ঐক্য দৃঢ় থাকলে তারা আমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।

আল্লাহর বান্দাগণ!

আমাদের এ জাতির বড় সম্পদ হল আমাদের যুব সমাজ। তাদের ও আমাদের সবার দীনের ওপর কঠোরভাবে অটল থাকতে হবে। শারিরিক ও অর্থনৈতিক শক্তি যেন আমাদের শয়তানের কুমন্ত্রাণায় না ফেলে এ ব্যাপারে বিশেষভাবে সাবধান থাকতে হবে। আপনারাই আগামী দিনের উম্মতের কাণ্ডারী। ভবিষ্যতে নেতৃত্বের চাবিকাঠি আপনাদের নাগালেই আসবে। আপনাদের কঠোরভাবে দায়িত্বসচেতনার সাথে নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে। প্রয়োজনে বিশ্চজনদের সাথে পরামর্শ করে দেশ পরিচালনায় মধ্যপন্থার নীতি অবলম্বন করতে হবে। কোথাও যেন বাড়াবাড়ি ও অন্যায় হস্তক্ষেপ না হয় সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে হবে। মনে রাখতে হবে আপনাদের দুশমনরা চারদিক থেকে মুসলিম যুবক-যুবতীদের চরিও হননের কাজে বিভিন্ন মিডিয়ায় সচেষ্ট রয়েছে। তাদরে ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম মিল্লার নগণকে যথাসময়ে ওয়াকিফহাল করতে হবে।

আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। (আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তিঁনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তাঁরই জন্য সর্ব প্রকার প্রশংসা)।

আল্লাহর বান্দাগণ!

আপনাদের যাবতীয় আমল যেন শুধুমাও আল্লাহরই জন্য হয় সে ব্যাপারে সতর্ক থাকুন। লোকদেখানোপনা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকুন। নামাযের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ থাকুন। ইসলামের রুকনগুলোর মধ্যে ঈমানের পরই নামাযের স্থান। আপনাদের সম্পদের যাকাত প্রদান করুন, রমযানের রোযা যথাযথভাবে সম্পাদন করুন। যাদুকর ও গণকদের ব্যাপারে সাবধান থাকুন। কোন ক্রমেই তাদের নিকট ধর্ণা দেবেন না। তাদের নিকট কোন প্রকার ইচ্ছা পূরণের জন্য গেলে তাতে শুধু বিপদের পর বিপদই আসবে। এ মর্মে প্রিয় নবীর সাবধানবাণী হচ্ছে:

“কোন মুসলিম যাদুকরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করলে সে যেন মুহাম্মাদ (সঃ)-এর আগত বিধানেরই অস্বীকার করল।”

হে মুসলিম ভ্রাতৃবৃন্দ!

সুস্পষ্ট ও জ্ঞানগর্ব আলোচনার মাধ্যমে আল্লাহর দীনের দিকে দাওয়াত দান অব্যাহত রাখুন। বিজ্ঞতা ও হিকমতের সাথে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ-এর শিক্ষা থেকে কখনো পিছপা হবেন না। এ কাজে বিরোধীতা আসলে তা ধৈর্য্যের সাথে মুকাবিলা করুন।

আল্লাহ আকবার আল্লাহ আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। (আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তিঁনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই, আল্লাহ মহান আল্লাহ মহান, তাঁরই জন্য সর্ব প্রকার প্রশংসা)।

হে পিতামাতাগণ!

আপনাদের ছেলেমেয়েদের যথার্থভাবে লালনপালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করুন। তাদের নিকট আপনারা অদর্শস্থানীয় হোন। সর্বদা তাদের অসৎ চরিত্রের সাঙ্গপাঙ্গদের থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করুন। ভালবাসা ও হৃদ্যতা দিয়ে তাদের সার্বিকভাবে দিকনির্দেশনা প্রদান করুন। চারিত্তিক, সাংস্কৃতিক ও দর্শনগতভাবে ইসলাম বিদ্বেশী পরিবারগুলোর চক্রান্ত থেকে তাদের হিফাযত করুন। নতুবা দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফল শূন্যে পরিণত হবে।

হে আল্লাহ!

আমাদের এ ঈদকে আপনার সন্তুষ্টির কারণ হিসেবে পরিগণিত করুন। আমাদের সব আমলগুলো কবুল করুন, জান্নাতের পথে চলা সহজতর করুন। আমাদের পাপরাশি ক্ষমা করুন ও আমাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন।
আজ এ কথাগুলো বলে আমি আমার নিজের, আপনাদের ও সমগ্র মুসলিম মিল্লাতের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আপনারাও তাঁর নিকট ক্ষমা প্রদর্শন ও তাওবা করুন। তিঁনিই ক্ষমাশীল ও দয়াময়।
তারিখঃ ১.১০.১৪২৮ হিজরী

ভাষান্তরে : ড. মুহাম্মদ ওয়ালি উল্লাহ
সহযোগী অধ্যাপক, দাওয়া বিভাগ, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নবী জীবনের কথানবী জীবনের কথা

সীরাতে ইবনে হিশাম

মূল: ইবনে হিশাম

অনুবাদ: আকরাম ফারুক

অতঃপর কুরাইশ গোত্রগুলো কাবা পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর সংগ্রহ করলো। প্রত্যেক গোত্র আলাদাভাবে সংগ্রহ করলো ও পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করলো। হাজরে আসোয়াদের স্থান পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে এবার তা যথাস্থানে কে স্থাপন করবে তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হলো। হাজরে আসওয়াদ তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করার সম্মান লাভের বাসনা প্রত্যেকেরই প্রবল হয়ে উঠলো। এ নিয়ে গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে লাগলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহ্বান জানালেন, "হে কুরাইশগণ, এই পবিত্র মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা এই বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব দাও।" সবাই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। অতঃপর দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, "এতো আমাদের আল আমীন (পরম বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ। তাঁর ফায়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদমান লোকদের কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হলে সবাই তাঁকে তাদের বিবাদের বিষয়টা জানালে তিনি বললেন, "আমাকে একখানা কাপড় দাও।" কাপড় দেয়া হলে তিনি তা বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ উক্ত কাপড়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করে বললেন, "প্রত্যেক গোত্রকে এই কাপড়ের চারপাশ ধরতে হবে।" সবাই তা ধরলো ও উঁচু করে যথাস্থানে নিয়ে রাখলো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন ও তার উপর গাঁথুনি দিলেন।

পবিত্র কা'বার পুনর্নির্মাণ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বয়স যখন পঁয়ত্রিশ বছর তখন কুরাইশগণ পবিত্র কা'বার ভবন সংস্কারের সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল পবিত্র কা'বার ছাদ তৈরি করা। কেননা ছাদ নির্মাণ না করলে দেয়াল ধসে যাওয়ার আশংকা ছিল। ঐ সময় কা'বার দেয়াল সাড়ে তিন হাতের সামান্য বেশি উঁচু ছিল এবং তাও শুধুমাত্র পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে নির্মিত ছিল। কোন গাঁথুনি ছিল না। ঘটনাক্রমে ঐ সময় জনৈক রোমান ব্যবসায়ীর একখানি জাহাজ সমুদ্রের প্রবাহের সাথে ভেসে জিদ্দার উপকূলে এসে আছড়ে পড়ে এবং ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। এই জাহাজের তক্তাগুলো কুরাইশরা নিয়ে যায় এবং পবিত্র কাবার ছাদ তৈরির কাজে ব্যবহার করার জন্য তা ছেঁটেকেটে ঠিকঠাক করে। মক্কার জনৈক মিসরীয় রাজমিস্ত্রিরও আবির্ভাব ঘটে একই সময়। পবিত্র কা'বার সংস্কার সাধনে তার দ্বারা কিছু লোক কাজে নেয়া যাবে বলে কুরাইশগণ মনে মনে স্থির করে ফেলে।

পবিত্র কা'বা সংলগ্ন কূপ থেকে তখন একটা সাপ প্রতিদিন উঠে আসতো এবং কা'বার দেয়ালের ওপরে বসে রোদ পোহাতো। যে কূপ থেকে সাপটা উঠে আসতো তার মধ্যে কা'বার জন্য প্রতিদিন উৎসর্গীকৃত জিনিসসমূহ নিক্ষেপ করা হতো। সাপের কারণে কুরাইশগণ আতংকিত ছিল। কেননা সাপটা এমন ভয়ংকর ছিল যে, কেউ তার ধারেও

ঘেঁষতে পারতো না। কেউ তার কাছে গেলেই ফনা বিস্তার করে সশব্দে চামড়ায় চামড়া ঘষে মোচড় খেতো এবং মুখ ব্যাদান করতো। এভাবে একদিন সাপটি যখন পবিত্র কা'বার দেয়ালের ওপর রোদ পোহাচ্ছিলো তখন আল্লাহ সেখানে একটি পাখি পাঠালেন। পাখি সাপটাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল। তখন কুরাইশগণ আশ্বস্ত হয়ে বললোঃ আশা করা যায় যে, আল্লাহ আমাদের ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছেন। আজ আমাদের কাছে একজন প্রীতিভাজন মিস্ত্রী রয়েছে, প্রয়োজনীয় কাঠের যোগাড় হয়ে গেছে। আর সাপের হাত থেকেও আল্লাহ নিষ্কৃতি দিয়েছেন।

অত:পর তারা কা'বার দেয়াল ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্মাণের আয়োজন করলো। এই সময় আবু ওয়াহাব ইবনে আমর ইবনে আয়েয ইবনে আবদ ইবনে ইমরান ইবনে মাখযুম উঠে কা'বার একটা পাথর বিচ্ছিন্ন করে হাতে তুলে নিল। কিন্তু পাথরটি তৎক্ষণাৎ তার হাত থেকে সটকে পড়লো এবং যেখানে তা ছিল সেখানে পুনঃ স্থাপিত হলো। এ আশ্চর্য ব্যাপারে দেখে সে বললো, "হে কুরাইশগণ, তোমরা এই কা'বার ভবন নির্মাণে শুধু তোমাদের বৈধভাবে উপার্জিত সম্পদ নিয়োজিত কর। এতে ব্যভিচার, সুদ কিংবা উৎপীড়ন দ্বারা অর্জিত সম্পদ ব্যয় করো না।"

অত:পর কুরাইশগণ কা'বার গৃহনির্মাণের কাজ নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। দরজার অংশ নির্মাণের ভার বনু আবদ মানাফ ও যুহরার ভাগে, রুকনে আসওয়াত ও রুকনে ইয়ামানীর মধ্যবর্তী অংশ নির্মাণের ভার বনী মাখযূম গোত্রের ভাগে এবং তাদের সাথে আরো কয়টি কুরাইশ গোত্র যুক্ত হলো, কা'বার মেঝে নির্মাণের ভার বনী জুমাহ ও বনী সাহামের ভাগে, আর হাজরে আসওয়াদ সংলগ্ন অংশ বনী আবদুদদার, বনী কুসাই, বনীক আসাদ ইবনে আবদুল উয্যা ও বনী আদী ইবনে কা'বের ভাগে পড়লো। এবার ভাঙ্গার কাজে হাত দেয়ার পালা। কিন্তু এ কাজে হাত দিতে প্রত্যেকেই এক অজানা ভয়ে ভীত হয়ে পড়লো। তখন ওয়ালীদ ইবনুল মুগীরা ঘোষণা করলো, "আমিই ভাঙ্গার কাজ শুরু করছি। এই বলে সে কোদাল হাতে নিয়ে জীর্ণ ভবনের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে বললো, "হে আল্লাহ, তোমার ধর্ম থেকে আমরা বিচ্যুতি হইনি এবং আমরা যা করছি তা সদুদ্দেশ্যেই করছি।" অতঃপর রুকনে ইয়ামানী ও রুকনে আসওয়াদের কোণ থেকে খানিকটা ভেঙ্গে ফেললো। পরবর্তী রাত সবাই উৎকণ্ঠার সাথে কাটালো। সবাই বললো, দেখা যাক, ওয়ালীদের ওপর কোন বিপদ আসে কিনা। যদি তেমন কিছু হয় তাহলে ভাঙবো না।

বরং যেটুকু ভাঙ্গা হয়েছে তা আবার জুড়ে সাবেক অবস্থায় বহাল করবো। অন্যথায় বুঝবো আল্লাহ আমাদের উদ্যোগে সন্তুষ্ট। অবশিষ্ট অংশও ভেঙ্গে ফেলবো।" ওয়ালীদ পরদিন সকালে স্বাভাবিকভাবে আরদ্ধ কাজে ফিরে এলো এবং কা'বার দেয়াল ভাঙতে আরম্ভ করলো। তার সাথে অন্যান্য লোকেরাও ভাঙতে লাগলো। এভাবে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের নির্মিত ভিত পর্যন্ত গিয়ে থামলো। অতঃপর তারা সবাই উটের পিঠের কূজাকৃতির দুর্লভ সবুজ পাথর সংগ্রহ করতে গেল, যার একটা আর একটার সাথে লেগে থাকে।

অতঃপর কুরাইশ গোত্রগুলো কাবা পুনঃনির্মাণের উদ্দেশ্যে পাথর সংগ্রহ করলো। প্রত্যেক গোত্র আলাদাভাবে সংগ্রহ করলো ও পুনঃনির্মাণের কাজ সমাধা করলো। হাজরে আসোয়াদের স্থান পর্যন্ত দেয়াল নির্মাণ সম্পন্ন হলে এবার তা যথাস্থানে কে স্থাপন করবে তা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ শুরু হলো। হাজরে আসওয়াদ তুলে নিয়ে যথাস্থানে স্থাপন করার সম্মান লাভের বাসনা প্রত্যেকেরই প্রবল হয়ে উঠলো। এ নিয়ে গোত্রগুলো সংঘবদ্ধ হতে লাগলো এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল।

বর্ণিত আছে যে, ঐ সময় সমগ্র কুরাইশ সম্প্রদায়ের প্রবীণতম ব্যক্তি আবু উমাইয়া ইবনুল মুগীরা নিম্নরূপ আহ্বান জানালেন, "হে কুরাইশগণ, এই পবিত্র মসজিদের দরজা দিয়ে যে ব্যক্তি প্রথম প্রবেশ করবে, তাকেই তোমরা এই বিবাদের মীমাংসার দায়িত্ব দাও।" সবাই এ প্রস্তাবে সম্মত হলো। অতঃপর দেখা গেল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সর্বপ্রথম প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখেই সবাই একবাক্যে বলে উঠলো, "এতো আমাদের আল আমীন (পরম বিশ্বস্ত) মুহাম্মদ। তাঁর ফায়সালা আমরা মাথা পেতে নেব।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাদমান লোকদের কাছাকাছি গিয়ে উপনীত হলে সবাই তাঁকে তাদের বিবাদের বিষয়টা জানালে তিনি বললেন, "আমাকে একখানা কাপড় দাও।" কাপড় দেয়া হলে তিনি তা বিছিয়ে হাজরে আসওয়াদ উক্ত কাপড়ের মধ্যস্থলে স্থাপন করে বললেন, "প্রত্যেক গোত্রকে এই কাপড়ের চারপাশ ধরতে হবে।" সবাই তা ধরলো ও উঁচু করে যথাস্থানে নিয়ে রাখলো। অতঃপর তিনি নিজ হাতে হাজরে আসওয়াদ তুলে যথাস্থানে রাখলেন ও তার উপর গাঁথুনি দিলেন। (চলবে)

মুসলিম বিশ্বের খবর

সৌদি আরবে বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মাণের পরিকল্পনা
সৌদি আরবের জেদ্দায় বিশ্বের সর্বোচ্চ টাওয়ার নির্মানের জন্য বিন লাদেন গ্রুপের সাথে ৪.৬ বিলিয়ন রিয়ালের (১.২৩ বিলিয়ন ডলার) চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন সৌদি বিলিয়নিয়ার প্রিন্স আল ওয়ালিদ বিন তালাল।

এক হাজারেরও বেশি মিটার লম্বা জেদ্দা টাওয়ারটি বানাতে সময় লাগবে পাঁচ বছরের কিছু বেশি সময়। বিন লাদেন গ্রুপের সাথে চুক্তি স্বাক্ষরের পর প্রিন্স আল ওয়ালিদ বলেন, জেদ্দায় এই টাওয়ার নির্মাণের মাধ্যমে একটা অর্থনৈতিক বার্তাও ছড়িয়ে দেয়া হচ্ছে।

এই টাওয়ারটির নির্মাণ শেষ হলে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা টাওয়ার দুবাইয়ের ৮২৮ মিটারের বুর্জ খরিফা দ্বিতীয় স্থানে নেমে যাবে। ১.৫ বিলিয়ন ডলার ব্যয়ে বুর্জ খলিফা নির্মাণ করেছিল এমার প্রোপার্টিজ। জেদ্দা টাওয়ারের একটি হোটেল, অ্যাপার্টমেন্ট, বিলাসবহুল কনডোমিনিয়াম, অফিস থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রের আড্রিয়ান স্মিথ প্লাস গর্ডন গিল এর ডিজাইন করেছে।

সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহর ভাতিজা প্রিন্স আল ওয়ালিদ বলেন, জেদ্দা টাওয়ার শেষ পর্যন্ত ১০০০ মিটার ছাড়িয়ে যাবে, তবে চূড়ান্ত উচ্চতা এখনই প্রকাশ করা হবে না। সঠিক উচ্চতা অল্প কিছু লোক জানে।

অর্থনৈতিক সঙ্কটে ফিলিস্তিন
দাতা দেশগুলোর অর্থ প্রদানে বিলম্ব এবং ইসরাইলি বিধিনিষেধের কারণে ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ অর্থনৈতিক সঙ্কটে ভুগছে। এ দিকে দেশটির রাষ্ট্রীয় পরিচয় লাভের আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে উঠেছে। ফিলিস্তিন গত ২ আগস্ট তার প্রায় এক লাখ ৭০ হাজার কর্মচারীর সবার পূর্ন বেতন পরিশোধ করেছে। এক মাস আগে তাদের বেতনের অর্ধেক পরিশোধের পর তারা ধর্মঘটের হুমকি দেয়।

তবে দেশটি সতর্ক করেছে যে তাদের তহবিল ঘাটতির মধ্যে এ ধরনের কার্যক্রম সরকারের দেশ চালানোর সামর্থ্যকে মারাত্মকবাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।প্রধানমন্ত্রী সালাম ফায়েদ বলেন, 'চলমান অর্থনৈতিক সঙ্কটের মধ্যে সম্পূর্ণ বেতন পরিশোধের ফলে পরবর্তী মাসে সরকারের অন্যান্য প্রয়োজন মেটচানোর ক্ষমতা হ্রাস পাবে এবং সবাই তা বোঝেন।' কয়েক মাস ধরে ফায়াদ দাতা দেশ বিশেষ করে আরব দেশগুলোর অঙ্গীকার করা অর্থ প্রদানে বিলম্বের কারণে ব্যাপক অর্থসঙ্কটের মুখে পড়ার বিষয়ে সতর্ক করে আসছেন।

২৬ জুলাই তিনি ফিলিস্তিনি প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের অনুরোধে আরব লিগের বিশেষ এক অধিবেশনে সদস্য দেশগুলোর অঙ্গীকার পালনের অনুরোধ জানানোর জন্য যোগদান করেন।

তিনি বলেন, ছয় মাস মেয়াদে আরব দেশগুলোর অঙ্গীকার করা ৩৩ কোটি মার্কিন ডলারের মধ্যে ২০১১ সালের এ পর্যন্ত সাত কোটি ৯০ লাখ মার্কিন ডলার ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষ পেয়েছে। সৌদি আরব সম্পূরক অনুদান হিসেবে পরে তিন কোটি মার্কিন ডলার প্রদান করেছে। তবে ফিলিস্তিনি বাজেটের এখনো বড় ধরনের ঘাটতি রয়ে গেছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়ন মঙ্গলবার বলেছে, তারা প্রায় ৮৩ হাজার কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের জুলাইয়ের বেতন ও অবসরভাতা প্রদানে কর্তৃপক্ষকে সহায়তা দেয়ার জন্য দুই কোটি ২৫ লাখ ইউরোপ পরিশোধ করেছে। জাতীয় অর্থনীতিবিষয়ক মন্ত্রী হাসান আবু লিবদাহ বলেন, ফিলিস্তিনি অর্থনীতি কাঠামোগত প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছে, যা ইসরাইল দখলদারিত্বের ফলাফল। এ মাসে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠক বসবে। ফিলিস্তিনকে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি চেয়ে ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ আবেদন জানাবে ওই বৈঠকে। আর ওই বৈঠকের আগে স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের বিষয়টি নিয়ে সম্প্রতিক আলোচনায় বসেন আরব লিগের প্রতিনিধিরা।

ছেলেকে উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিলেন সৌদি বাদশাহ

সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজ তার ছেলে প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহকে গত ২২ জুলাই দেশের উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। সরকারি বার্তা সংস্থা এসপিএ রাজকীয় ফরমানের বরাতে জানায়, প্রিন্স আবদুল আজিজ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল আজিজকে মন্ত্রীর পদমর্যাদায় উপপররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন বাদশাহ। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা জানায়, গুচ্ছ নিয়োগের অংশ হিসেবে বাদশাহ এই নিয়োগ দিলেন। বাদশাহ আবদুল্লাহ ও তার ভাই প্রতিরক্ষামন্ত্রী যুবরাজ সুলতান উভয়েই সাম্প্রতিক বচরগুলোতে চিকিৎসার জন্য কয়েকবার বিদেশে গেছেন।

১৯৭৫ সাল থেকে সউদ আল-ফয়সাল সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছেন। তিনি ঘাড় ও পিঠের সমস্যায় ভুগেছেন। আগামীতে প্রিন্স আজিজ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব পাবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। প্রিন্স আবদুল আজিজ উপপরাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পাওয়ার আগে আঞ্চলিক গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে তার বাবা বাদশাহ আবদুল্লাহর বিশেষ দূত ছিলেন। বিশেষ করে তিনি সিরিয়া বিষয়ক বিশেষ দূত ছিলেন। এর আগে বাদশাহ আবদুল্লাহ তার অন্য ছেলে মুতিককে ২০১০ সালে ন্যাশনাল গার্ডের প্রধান নিয়োগ করেন।

ধর্মঘটে কাশ্মিরের জীবনযাত্রা অচল পুলিশ হেফাজতে তরুণের মৃত্যু

স্বাধীনতাকামীদের ডাকা ধর্মঘটে গত ৩ আগস্ট ভারত অধিকৃত কাশ্মিরে জনজীবন অচল হয়ে পড়ে। পুলিশ হেফাজতে এক তরুণের মৃত্যুর প্রতিবাদে স্বাধীনতাকামীদের জোট হুরিয়াত কনফারেন্সের দুই অংশের নেতা সৈয়দ আলী গিলানি ও মির ওয়াইজ উমর ফারুক এই ধর্মঘটের ডাক দেন। ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল, পুলিশ হেফাজতে জামিন রাশিদ ওরফে আঞ্জুমের (২৬) মারা যাওয়ার ঘটনাটির দিকে আন্তর্জাতিক মনোযোগ আকর্ষণ করা। জামিনা রাশিদ আঞ্জুম ৩১ জুলাই উত্তর কাশ্মিরের মোপোর শহরে পুলিশ রয়েছেন হেফাজতে মারা যান। ধর্মঘটকালে কাশ্মিরে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও জনপরিবহন বন্ধ ছিল। ধর্মঘটের ফলে সরকারি অফিস, ব্যাংক ও পোস্ট অফিস কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল খুব কম।

সূত্র জানায়, জামিন রশিদের মৃত্যুর বিষয়টি তদন্তের দায়িত্বে রয়েছেন মোপোর মহুকুমা ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ আহসান মির। রশিদের মৃত্যুর সময় কোন কোন পুলিশ সদস্য দায়িত্ব পালন করেছেন তাদের সবার সম্পর্কে বিস্ত

ারিত জানাতে পুলিশকে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। একজন পুলিশ কর্মকর্তা জানান, এই মৃত্যুর ঘটনা তদন্তের জন্য উত্তর কাশ্মিরের ডেপুটি আইজিপি মুনির আহমেদ খানকে একটি বিশেষ তদন্ত দল গঠনের নির্দেশ দিয়েছে সরকার। রশিদের মৃত্যুর ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত নিশ্চিত করতে সোপোরের এসপিকে বদলি করেছে রাজ্য সরকার।

বেন আলীর আরো ১৫ বছর কারাদণ্ড

মাদক, অস্ত্র ও পুরাকীর্তি চোরাচালানের অভিযোগে তিউনিসিয়াপর ক্ষমতাচ্যুত সাবেক প্রেসিডেন্ট বেন আলীকে ১৫ বছর কারাদণ্ড দিয়েছে দেশটির একটি আদালত। বেন আলীর অনুপস্থিতিতে শুনানি শেষে আদালতের বিচারক এই রায় দেন। এ সময় বিচারক তাউমি হাফি বেন আলীর প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, 'অভিযুক্ত অনুপস্থিত এবং পলাতক।' ওই রায়ে কারাদণ্ডের পাশাপাশি বেন আলিকে ৭২ হাজার মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়। এর আগে গত ২০ জুন চুরি ও জনগণের অর্থসম্পদ আত্মসাতের অভিযোগে দায়ের করা মামলায় বেন আলী ও তার স্ত্রী লায়লা ত্রাবিলিসিকে ৩৫ বছর কারাদণ্ড এবং ৬ কোটি ৫৬ লাখ মার্কিন ডলার জরিমানা করা হয়।

আফগানিস্তানে নিহত ৩১ মার্কিন সৈন্যের ২২ জন ওসামা হত্যায় অংশ নেন

আফগানিস্তানের ওয়ারদাক প্রদেশে গত ৬ আগস্ট তালেবান হামলায় হেলিকপ্টার ভূপাতিত হয়ে নিহত ৩১ জন মার্কিন সৈন্যের মধ্যে ২২ জনই ছিলেন ওসামা বিন লাদেন হত্যায় অংশগ্রহণকারী ইউনিটের সদস্য। গত ৭ আগস্ট ওয়াশিংটন পোস্টের খবরে এ কথা বলা হয়।

পত্রিকাটির খবরে বলা হয়, গত ১ মে পাকিস্তানের অ্যাবোটাবাদে আলকায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেন হত্যায় অংশগ্রহণ করেছিল মার্কিন এলিট ফোর্স নেভি সিল টিম সিক্স। অতি গুরুত্বপূর্ণ ও ঝুঁকিপূর্ণ অভিযানে মার্কিন সশস্ত্রবাহিনীর এ শ্রেষ্ঠতম ইউনিট পাঠানো হয়।

সংগ্রহে:আহমদ রাফিদ ফারহান

রাসূলের (সা:) যুগে নারী স্বাধীনতা

মূলঃ আবদুল হালীম আবু শুক্‌কাহ

অনুবাদঃ মওলানা আবদুল মুনয়েম

অধ্যাপক আবুল কালাম পাটওয়ারী

মওলানা মুনাওয়ার হোসাইন

॥ ঊনিশ॥

হযরত হাওয়ার (আ:) প্রতি যেসব দোষারোপ করা হয়ে থাকে, আল্লাহর ফযলে পবিত্র কুরআন মজীদের এসব আয়াত ও অন্যান্য স্থানে বর্ণিত বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে সেগুলো খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা অনেকেরই ধারণা, হযরত হাওয়া (আ:) প্রথমে নিষিদ্ধ গাছের ফল ভক্ষণ করেন ও হযরত আদম (আ:) কেও তা খেতে উদ্বুদ্ধ করেন। অথচ আল কুরআন স্পষ্টভাবে ঘোষণা করছে যে, হযরত হাওয়া (আ:) কে নয়, বরং আদমকেই শয়তান প্রথমে প্রভাবিত করেছিল।

"আল্লাহ ধন-সম্পদ দ্বারা কাউকে কারও উপর প্রাধান্য দান করেছেন, তোমরা তার লালসা কর না। পুরুষ যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ এবং নারী যা অর্জন করে তা তার প্রাপ্য অংশ। আল্লাহর অনুগ্রহ প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় প্রত্যেক বিষয়েই জানেন।" (আন নিসা : ৩২)

"হে ঈমানদার লোকেরা! কোন পুরুষ যেন অন্য পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারীর চেয়ে উত্তমও হতে পারে। আর কোন নারী যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, কারণ যাকে বিদ্রূপ করা হয় সে বিদ্রূপকারিনীর চেয়ে উত্তম হতে পারে। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করো না। একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানদারদের পক্ষে অন্যকে মন্দ নামে সম্বোধন করা ফাসেকী কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করবে না তারাই জালেম।" (আল হুজুরাত : ১১)

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা:) কোন বিষয়ের ফায়সালা দিলে কোন মুমিন নর-নারীর পক্ষেই তার বিরুদ্ধাচরণ করার অধিকার থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সা:)-এর ফায়সালার বিরুদ্ধাচরণ করে ভিন্নমত পোষণ করলে সে নির্ঘাত পথভ্রষ্ট হবে।" (আল আহযাব : ৩৬)

"তারাই তো কুফরী করেছে ও তোমাদেরকে বাইতুল্লাহ শরীফ পর্যন্ত পোঁছতে বাধা দিয়েছে, এমনকি কুরবানীর পশুগুলোকেও কুরবানগাহে নিতে দেয়নি। মক্কা নগরীতে যদি মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকদের বিরাট সংখ্যক না থাকত, যাদের ঈমান আনার ব্যাপারে তোরমা কল্পনাও করতে পার না এবং অজ্ঞতাবশত তাদেরকেও নিশেষ করার কারণে সমূহ ক্ষতি ও বদনামের আশংকা না থাকত, তাহলে অবশ্যই আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি দিতেন। যুদ্ধের অনুমতি না দিয়ে আল্লাহ যাদেরকে ইচ্ছা ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দেবেন। আর মক্কার সে পরিবেশে মুমিনরা যদি আলাদা থাকত, তাহলে যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে তোমাদের দ্বারা কাফেরদেরকে সমুচিত শিক্ষা দিতেন।" (আল ফাতহ : ২৫)

"যারা হযরত আয়েশার বিরুদ্ধে এ অপবাদ রচনা করেছে তারা তোমাদেরই একটি ক্ষুদ্র দর। এ ঘটনাকে তোমাদের জন্য খারাপ মনে করো না বরং এও তোমাদের জন্য কল্যাণকরই হবে। যারা এ ব্যাপারে যত বেশী

তৎপরতা প্রদর্শন করেছে, তারা ততই গুনাহে লিপ্ত হয়েছে। আর তাদের মাধ্যমে যে ব্যক্তি এ ঘটনায় নেতৃত্ব দিয়েছে, তার জন্য নির্ধারিত অপবাদ বললে না?" (আন নূর : ১১-১২)

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার পিতামাতাকে এবং ঈমান এনে যারা আমার ঘরে প্রবেশ করেছে তাদের সবাইকে এবং সমস্ত মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ক্ষমা করে দাও। আর জালেমদের শুধু ধ্বংসই বৃদ্ধি কর।" (নূহ ধ ২৮)
"সুতরাং হে নবী, ভাল করে জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই। কাজেই নিজের ত্রুটি ও মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর গুনাহ-খাতার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ তোমাদের তৎপরত ও গতিবিধি এভং অবস্থান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত আছেন।" (মুহাম্মদ-১৯)

"নিশ্চয়ই মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী, আল্লাহর অনুগত পুরুষ ও অনুগত নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীল নারী, বিনীত পুরুষ ও বিনীত নারী, দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী, রোযা পালনকারী পুরুষ ও রোযা পালনকারী নারী, লজ্জাস্থান হেফাযতকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থান হেফাযতকারী নারী এবং সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণখারী পুরুষদের ও সর্বক্ষণ আল্লাহকে স্মরণকারী নারীদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও উত্তম পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে।" (আল আহযাব : ৩৫)

"নিশ্চয়ই দানশীল পুরুষ ও দানশীল নারী এবং যারা আল্লাহকে উত্তম দান করে তাদের সওয়াবকে কয়েকগুণ বেশী করে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে সর্বোত্তম পুরস্কার।" (আল হাদীদ : ১৮)

"আল্লাহ মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে ওয়াদা করেছেন জান্নাতের– যার তলদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবহমান, যেখানে তারা স্থায়ী হবে– এভং চিরস্থায়ী জান্নাতে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন বাসস্থানের। আল্লাহর সন্তুষ্টিই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং এটিই মহা সাফল্য।" (সূরা তওবা : ৭২)
"এটা এজন্য যে, মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীকে চিরকাল বসবাসের উদ্দেশ্যে এমন সব জান্নাতে প্রবেশ করান হবে যার তলদেশে চির প্রবহমান নহরসমূহ থাকবে এবং তিনি তাদের সমস্ত দোষ তাদের থেকে দূর করে দেবেন। এটাই আল্লাহর দৃষ্টিতে মুমিন পুরুষ ও নারীর মহা সাফল্য।" (আল ফাতহ : ৫)

"সেদিন যখন তোমরা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের দেখবে যে, তাদের নূর তাদের সামনে ও ডান পাশে ধাবিত হবে। তাদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ, যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত থাকবে যেকানে তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে। এটাই মহা সাফল্য।" (আল হাদীদ : ১২)

"মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী একে অপরের অনুরূপ। তারা অন্যায় কাজের নির্দেশ দেয় ও ভাল কাজে নিষেধ করে। কল্যাণকর কাজ থেকে বা আল্লাহর পথে দান করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, ফলে আল্লাহও তাদেরকে ভুলে গেছেন। এই মুনাফিকরাই সত্যিকার অর্থে পাপাচারী।
মুনাফিক পুরুষ ও নারী এভং কাফেরদের জন্য আল্লাহ জাহান্নামের অগ্নির সিদ্ধান্ত নিয়েছেনএসখানে অনন্তকাল তাদেরকে দগ্ধ করা হবে। এটাই তাদের যথার্থ প্রাপ্য। তাদেরকে আল্লাহ ধিক্কার দিয়েছেন এবং তাদের জন্য চিরস্থায়ী শাস্তি অবধারিত।" (আত তওবা : ৬৭০৬৮)

"এবং মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী, মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারী যারাই আল্লাহর প্রভুত্বের ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে তাদেরকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন। সত্যিকার অর্থে তারাই অমঙ্গল চক্রে গুরপাক খাচ্ছে। আল্লাহ তাদের উপরে রাহান্বিত হয়েছেন ও তাদের প্রতি অভিশাপ বর্ষণ করেছেন তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন, যা তাদের জন্য সবচেয়ে নিকৃষ্ট আবাস।" (আল ফাতহ-৬)

"আল্লাহর নির্দেশিত জীবন বিধান প্রত্যাখ্যানের পরিনাম হলো এই যে, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারী এবং মুশরিক পুরুষ ও মুশরিক নারীকে শাস্তি দেবেন এবং মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর তওবা কবুল করবেন। আর প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ বড়ই দয়াবান ও ক্ষমাশীল।" (আল আহযাব-৭৩)

"সেদিন মুনাফিক পুরুষ ও মুনাফিক নারীরা ঈমানদারদের কাকুতি-মিনতি করে বরবে, আমাদের জন্য একটু থাম যাতে তোমাদের আলো থেকে কিছুটা গ্রহণ করতে পারিআদেরকে বলা হবে, তোমরা পিছনে ফিরে যাও এবং আলোর সন্ধান কর। তারপর তাদের মাঝখানে একমাত্র দরজা বিশিষ্ট একটা প্রাচীন দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, তার ভিতরে থাকবে আল্লাহর রহমত এবং বাইরে কঠিন আযাব।" (আল হাদীস-১৩)

"ধ্বংস হোক আবু লাহাবের দু'হাত এবং সে নিজেও ধ্বংস হোক। তার ধন-সম্পদ ও তার উপার্জন তার কোনই কাজে আসেনি। অচিরেই তাকে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হবে এবং তার সাথে ইন্ধন বহনকারিণী তার স্ত্রীকেও। তার গলায় বাঁধা হবে পাকানো শক্ত রশি।" (আল লাহাব : ১-৫)
নারীর ব্যক্তি স্বাধীনতা
তার ইসলাম গ্রহণ করার বা না করার স্বাধীনতা দানের ব্যাপারে আল কুরআনের ভাষ্য।

"আল্লাহ কাফেরদের জন্য নূহ ও লুতের স্ত্রীদের উদাহরণ পেশ করছেন, তারা ছিল আমার দুই নেক বান্দার স্ত্রী। কিন্তু তারা তাদের স্বামীদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। তাই আল্লাহর শাস্তি থেকে নূহ ও লূত তাদেরকে রক্ষা করতে পারেনি। তাদেরকে বলা হয়েছে দোযখবাসীদের সাথে তোমরা জাহান্নামেই প্রবেশ কর। এমনিভাবে আল্লাহ মুমিনদের জন্যও ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ পেশ করছেন। সে প্রার্থনা করেছিল হে আল্লাহ! তোমার জান্নাতে আমার জন্য একটি ঘর তৈরি করে দাও এবং ফেরাউন ও তার পাপাচার ও দুষ্কৃতি থেকে আমাকে রক্ষা কর। সাথে সাথে ফেরাউনের জালেম সম্প্রদায়ের হাত থেকেও আমাকে রক্ষা কর।

আল্লাহ এমনিভাবে ইমরান-তনয়া মারয়ামেরও একটি উদাহরণ পেশ করেছেন। সে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। ফলে আমি তার মধ্যে নিজের পক্ষ হতে রূহ ফুৎকার করে দিলাম এবং সে তার আল্লাহর কথা ও তাঁর কিতাবসমূহকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল। প্রকৃতপক্ষে সে অনুগত ও বিনয়ীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল।" (আত তাহরীম : ১-১২) (চলবে)

মাসআলা-মাসায়েল

মুহাম্মাদ তাজুল ইসলাম

সালাতের মাকরূহসমূহঃ

গত সংখ্যায় আমরা সালাতের বেশ কিছু মাকরূহ আলোচনা করেছি। ইনশা আল্লাহ আজ আমরা আরও কিছু কারণ উল্লেখ করবো যার দ্বারা সালাত মাকরূহ হয়ে যায়।

৭. কোমরে হাত রাখা : সালাত আদায়ের সময় কোমরে হাত রাখা ঠিক নয়। কারণ, এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। আবু হুরায়রা রা. বলেন, "রাসূলুল্লাহ স. কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করতে নিষেধ করেছেন"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ১২২০] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, "সালাত আদায়কারী ব্যক্তি কোমরে হাত রেখে সালাত আদায় করাকে আয়িশা রা. অপছন্দ করতেন এবং বলতেন, ইয়াহূদীরা এরূপ করে"। [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৩৪৫৮]

৮. বৈঠকে হাতের ওপর ঠেস দিয়ে বসে থাকা : সালাত আদায়ের সময় বৈঠকে হাতকে মাটি বা মুসল্লার ওপর রেখে ঠেস দিয়ে বসে থাকা উচিত নয়। কারণ এমন বৈঠক আল্লাহর ক্রোধভাজন ইয়াহূদীদের। আব্দুল্লাহ ইবন উমার রা. বলেন, "হাতের ওপর ঠেস দিয়ে বসে সালাত আদায় করা থেকে রাসূলুল্লাহ স. বারণ করেছেন"। [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নম্বর : ৯৯২, হাদীসটি সহীহ, শায়খ আলবানী]

৯. আঙ্গুল ফুটানো : সালাতের মধ্যে আঙ্গুল ফুটানো মাকরূহ। কারণ এটি একটি অনর্থক ও অপ্রাসঙ্গিক কাজ যা অপর নামাযীদের মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। রাসূলুল্লাহ স. বলেছেন, "তোমাদের কেউ যখন ভালভাবে অযূ করে স্বেচ্ছায় মসজিদে যায় তখন সে যেন আঙ্গুল না ফুটায়" [সুনান তিরমিযী, হাদীস ৩৮৭, হাদীসটি সহীহ]। এ হাদীসে মসজিদে আঙ্গুল ফুটাতে নিষেধ করা হয়েছে। আর তা যদি সালাতরত অবস্থায় হয় তবে আরো শক্তভাবে নিষেধ হবে। ইবন উমার রা. এক লোককে সালাতে আঙ্গুল ফুটাতে দেখে মন্তব্য করলেন, এটি অভিশপ্তদর সালাত [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নম্বর : ৯৯৩]। আঙ্গুল ফুটানোর এ বিষয়টি সালাত শুরু করার পূর্ব মুহুর্তে ও সালাতরত অবস্থায় নিষিদ্ধ। সালাতের পরে এরূপ করলে তাতে কোনো দোষ নেই। আবূ হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ স. আমাদেরকে নিয়ে দু'রাকাত সালাত আদায় করে মসজিদে ঝুলানো একটি কাঠের সাথে হেলান দেন। তাঁর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন রাগান্বিত। তারপর তিনি ডান হাত বাম হাতের ওপর রাখলেন এবং নিজের আঙ্গুলসমূহ ফুটালেন [সহীহ বুখারী, হাদীস নম্বর : ৫৭৩]।

১০. কাপড়, শাল বা চাদর না জড়িয়ে কাঁধের দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখা : সালাত আদায়ের সময় চাদর বা শাল না জড়িয়ে দু'কাঁধে দু'দিকে ঝুলিয়ে রাখা অথবা চাদরে জড়িয়ে থাকা অবস্থায় হাত দু'টিকেও তার ভিতরে রেখেই রুকু‘ ও সাজদা করা। আবূ হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবীজী স. সালাতে এভাবে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন [সুনান আবু দাউদ, হাদীস নম্বর : ৬৪৩]। এর কারণ হলো, এটি ইয়াহূদীদের আচরণ ও অভ্যাস।

অনুরূপ চাদর বা কাপড় দ্বারা মুখ ঢেকে সালাত আদায় করাও মাকরূহ। রাসূলুল্লাহ স. এরূপ করতে বারণ করেছেন। (চলবে)

লেখক : ম্যানেজার, কাউন্সিল ফর ইসলামিক রিসার্চ

ইসলাম ও মানবাধিকার

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

মানবাধিকার সংরক্ষণ ও এর লঙ্ঘনের ইতিহাস মানব জাতির ইতিহাসের মতই প্রাচীন। যদিও কেউ কেউ মনে করে থাকেন এর ইতিহাস খুব বেশী দিন আগের নয়। তাদের ধারণা বিগত দেড়শত থেকে দুইশত বছরের মধ্যে প্রথম জাতিসংঘ ও এর অঙ্গ সংগঠনের মাধ্যমে কতিপয় বিষয়ের আইন করে মানবাধিকারের সুরক্ষা দান করা হয়েছে। এই ধারণাটি মোটেও সঠিক নয়। কেননা আমরা জানি আজ থেকে প্রায় পনেরশত বছর পূর্বে হযরত মুহাম্মদ (স:) কেবলমাত্র মানবাধিকারই নয় বরং সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীকূলের অধিকারের সনদ পাশ করেই ক্ষান্ড় হন নাই বরং তিনি তার যথাযথ বাস্ড়বায়ন করে বিশ্ববাসির জন্য উদাহরণ সৃষ্টি করে গেছেন। ইসলাম সনদ পাশের সাথে এর বাস্ড়ব প্রয়োগকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে থাকে আর পাশ্চাত্য এর উল্টা।

জাতিসংঘ ১৯৬১ সালে দাস প্রথা উচ্ছেদ ও বিলোপ সাধন করেছে ঠিক কিন্ড়ু বিশ্বের তুলনামূলক দেশ ও জাতিকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে দাস বানানোর প্রাণান্ড়কর প্রচেষ্টা অতীতের দেড় হাজার বছর পূর্বে বিলোপ সাধন করেছে। সর্বশেষ বিদায় হজ্জের ভাষণে হযরত মুহাম্মদ স. বলেছেন- তোমরা সকলে ভাই ভাই। কালোর উপর সাদার কোন প্রাধান্য আজ থেকে আর থাকবে না। তিনি কালো কুৎসিত হযরত বেলালকে মুয়াজ্জিন হিসেবে নিযুক্ত করে বর্ণবাদকে কবর দেন।

১৯৬৩ সালে জাতিসংঘ বর্ণ বৈষম্য প্রথা বিলোপ করে একটি বিল পাশ করলেও তারা খুব বেশী কিছু বাস্ড়বায়ন করতে পারে নাই। এ কারণে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী নেতা নেলসন মেন্ডেলাকে এ প্রথা বিলোপ সাধনের জন্য এ শতাব্দির ষাটের দশক থেকে নব্বই দশক পর্যন্ড় এক নাগাড়ে ২৭ বছর যাবৎ জেল খাটতে হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীর মানবাধিকার সংরক্ষণের মেকী দাবীদার ও বিশ্বব্যাপী মানবাধিকারের সবচেয়ে বড় লঙ্ঘনকারী মর্কিন যুক্তরাষ্ট্রও বর্ণবাদের শিকার লুই ফার্‌রাহ খানকে লাখ লাখ লোকের সমাবেশ করে ৯০ এর দশকেও দাবী জানাতে হয় বর্ণবাদী প্রথার নির্মমতার হাত থেকে বাঁচার জন্য। তাও কি তারা মুক্তি পেয়েছেন? না বরং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সমাবেশ করার অপরাধে এমনভাবে তাকে শায়েস্ড় হতে হয়েছে যে তার কণ্ঠ একেবারে স্ড়ব্ধ করে দেয়া হয়েছে।

বর্তমান পৃথিবীর অন্যতম ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে বর্ণ বৈষম্য কত বড় প্রকট তা ভারতের হরিজন সম্প্রদায়ের নেতা ও সংবিধান প্রণেতা আম্বেদ করের বক্তব্য থেকে খানিকটা অনুভব করা যাবে। ১৯৩০-৩১ সনে তিনি লন্ডনের একটি গোল টেবিল বৈঠকে দুঃখের সাথে বলেছিলেন। ১৯৩০ সালে একদল হরিজন তাদের একজন বরকে রাজপুতদের মত সাজিয়ে ঘোড়ায় আরোহন করানোকে বর্ণ হিন্দুরা চরম ধৃষ্টতা হিসেবে নিয়ে ১১ দফা নির্দেশ জারি করে হরিজনদের জন্য। তার মধ্যে উলে খযোগ্য হল, হরিজনরা, হাঁটুর নিচে কাপড় পরতে পারবেনা। তাদের মেয়েরা স্বর্ণালংকার পরতে এবং তামা পিতলের পাত্রে পানি নিতে পারবেনা। তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুলে লেখাপড়া করতে পারবেনা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা বর্ণ হিন্দুদের পশু চরাবে এবং তাদের দাস হিসেবে কাজ করবে। হরিজনরা বর্ণ হিন্দুদের ছায়া মাড়াতে পারবেনা। এর জন্য তারা রাস্ড়ায় বের হলে ঘণ্টা বাজিয়ে পথ চলবে যাতে বর্ণ হিন্দুরা অচ্ছুতদের হাত থেকে বেঁচে থাকতে পারে অথবা তাদের ছায়া মাড়াতে না হয়।

কথিত আছে যে, আম্বেদকর ভারতের সংবিধানের প্রণেতা হওয়া সত্ত্বেও হরিজন সম্প্রদায়ের হওয়ার কারণে সরকারী ভবনে বসে অফিস পর্যন্ত করতে পারেননি। তার জন্য শন দিয়ে আলাদা বসার স্থান করা হয়েছে। মণ্ডল কমিশনে হরিজনদের চাকুরীর কোটা রাখার কারণে বর্ণবাদী হিন্দুরা প্রতিবাদ করতে গিয়ে গায়ে কেরসিন ঢেলে এ শতাব্দির শেষদিকে ভারতের মাটিতে আত্মহত্যা করতে দেখা গেছে। এ কারণে উক্ত কমিশন বাতিল করা হয়। বর্ণবাদকে ধরা থেকে চিরতরে উচ্ছেদ করার জন্য আল্লাহর নবী হযরত মুহাম্মদ স. কুরাইশ বংশীয় ফাতেমী গোত্রের মেয়ে নিজের স্ত্রী জয়নাবকে তারই আজাদ করা গোলাম যায়েদের সহিত বিয়ে দেন। আরবের সবচেয়ে উচ্চবংশীয় একজন মেয়েকে সাধারণ একজন ক্রীতদাসের সহিত বিয়ে দেয়া কত কঠিন কাজ তা সহজেই অনুমেয়।

জাতিসংঘের মত প্রতিষ্ঠানে হাত উত্তোলন করে প্রস্তাব যত সহজে পাশ করা যায় বাস্তবে তা কোন মতেই কার্যকরী করা যায়না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ধরনের নজির খুবই কম। অথচ আল্লাহর রাসূল স. তা বাস্তবায়ন করেছেন। বর্তমান পৃথিবীর মানবতাবাদীরা মানবাধিকারের কথা মুখে যতখানি বলতে ভালবাসেন বাস্তবে ততখানি করতে আগ্রহী নন। অথচ ইসলাম ও এর বার্তা বাহক হযরত মুহাম্মদ স. কথা ও কাজে ছিলেন এক ও অভিন্ন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এসব কথা বল যা তোমরা নিজেরা করনা। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণিত কাজ হলো- যা তোমরা বল তা নিজেরা করনা। শুধু তাই নয়, মহানবী স. মুতার যুদ্ধের মাত্র কিছুদিন আগে আজাদ করা নিজের ক্রীতদাস হযরত যায়েদকে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত করেন। তার পুত্র উসামাকে রোমের যুদ্ধে সেনাপতি করা হয়। অথচ এসব যুদ্ধে মুহাজের আনসারসহ সকল মুসলমানগণ অংশগ্রহণ করেন। বর্ণবাদ নির্মুলে এরচেয়ে উত্তম নজির আর কি হতে পারে?"

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন যারা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মানবাধিকার লংঘনের সক্রিয় সহযোগিতার দায়ে দায়বদ্ধ, তারা ১৯৫৯ সালে শিশুদের অধিকার, ১৯৬৩ সালে বর্ণবৈষম্য বিলোপ, ১৯৫১ সালে উদ্বাস্তুদের নিরাপত্তা, ১৯৫২ সালে নারীদের রাজনৈতিক অধিকার, ১৯৫৭ সালে বিবাহিত নারীদের জাতীয়তা নির্ধারণ, ১৯৬১ সালে দাস প্রথার উচ্ছেদ সাধন এবং ১৯৬৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রস্তাব অনুমোদন করে। উপর্যুক্ত এসব অধিকার বাস্তবায়ন করে বিশ্ববাসীর নিকট নজির স্থাপন করেছেন মহানবী স.। মাত্র ৫০ বছর পূর্বে জাতিসংঘ শিশু অধিকার আইন পাশ করলেও পনেরশত বছর পূর্বে রাসূল স. বলেছেন- "যে আমাদের বড়দের শ্রদ্ধা করেনা, আর ছোটদের স্নেহ করেনা সে আমার উম্মত নয়।" ঈদের দিনে ক্রন্দনরত শিশুকে বাড়ীতে নিয়ে নিজ হাতে জামা কাপড় পরিয়ে তাকে দত্তক সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে শিশু অধিকার বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছেন।"
বিশ শতকের মাঝামাঝি ওরিয়েন্টালিস্টরা যুদ্ধবন্দিদের অধিকার বিষয়ক আইন পাশ করে। অথচ ৬২৪ খ্রী. মহানবী স. বদর যুদ্ধের যুদ্ধবন্দিদের বিষয়ে সম্মানজনক বিধিবদ্ধ নিয়ম চালু করেন যে, বিজয়ী সৈনিকরা না খেয়েও যুদ্ধবন্দিদের খাওয়াবেন, তদের সাথে উত্তম আচরণ করবে। ১৮৬৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন করে দাস প্রথা বন্ধ করে দেয়। এই আইন পাশ করতে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় তাতে মাত্র ৬ লাখ ২৫ হাজার মানুষ নিহত হয়। অথচ পনেরশত বছর পূর্বে এটি মহানবী বাস্তবায়ন করেছেন। এই আইন বাস্তবায়ন করার জন্য একজন আদম সন্তানকেও প্রাণ দিতে হয়নি।"

১৮৩৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েরা সর্বপ্রথম স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। অথচ দেড় হাজার বছর আগে রাসূল স. বলেছেন- বিদ্যা অর্জন করা প্রত্যেক নর-নারীর উপর ফরজ। এখানে তিনি মুসলমান নরের কথা বলে ক্ষান্ত হননি বরং মুসলমান নর-নারী বলে মহিলাদের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। ১৮৪৮ সালে মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে

মেয়েরা সম্পত্তি ভোগের অধিকার পায় অথচ ইসলামের যাত্রালগ্নে মেয়েদেরকে ছেলেদের চেয়ে বেশী মর্যাদা দিয়ে পিতা, স্বামী, ভাইয়ের সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার বানানো হয়। একই সাথে তাকে তার সকল সম্পদ জমা করার এবং পারিবারিক ব্যয়ের দায় থেকে মুক্ত রাখা হয়। ১৯২০ সালে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সওদাগর বিশ্ব মোড়ল এ দেশটিতে মেয়েরা ভোটাধিকার লাভ করে অথচ রাসূল স. এর যুগে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রে নারীরা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রা. এর নির্বাচনের নারীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেছিল।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দিতে যারা নারীদের অধিকার বিষয়ে কিছু কিছু আইন পাশ করে তাদের পূর্বসূরীরা নারীদের সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করত তা ছিল নিরূপ: পোপ শাসিত পবিত্র রোম সম্রাজ্যে নারীদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হতো। দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সাথে তাদেরকে বেঁধে রাস্তায় হেচড়ানো হত। মজবুত স্তম্ভে বেঁধে তাদেরকে আগুনে পোড়ানো হত। সপ্তদশ শতাব্দিতে কাউন্সিল অব দ্য ওয়াইজ এর অধিবেশনে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ছিল নারীদের কোন আত্মা নেই। অনুরূপভাবে ১৫০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য গঠিত পরিষদ নারী জাতির ওপর নির্মম নিষ্ঠুর নির্যাতন চালানোর উপায় উদ্ভাবন করে। তাদের আইনে নব্বই লক্ষ নারীকে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। আজও বৃদ্ধা নারীদেরকে পাশ্চাত্যে ডাইনী হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকে।

অথচ ইসলাম বলেছে, কারো যদি মাতা পিতা দুইজন অথবা একজনকে কেউ জীবিত পেল আর তাদের খেদমত করার মাধ্যমে বেহেশত অর্জন করতে পারল না তারচেয়ে হতভাগা আর কেউ নেই। আল্লাহর রাসূল স. এ ও বলেছেন- “মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেশত”। অতএব সন্তানকে অবশ্যই তার মাতা পিতার খেদমত করে বেহেশত হাসিল করতে হবে। আজকের বিংশ শতাব্দির এ সময়ে যারা মানবাধিকারের রাজনৈতিক বুলি আওড়ান এবং এর পক্ষে চৌকিদারীর ভাব দেখান তাদের সমাজের দু-একটি খণ্ড চিত্র দেখা যেতে পারে। বৃটেনের এক মহিলা একদিন ভীষণ খুশি। যাকে পান তাকে বলে বেড়াচ্ছেন জান! আজ আমার ছেলে আমাকে ফোন করে বলেছে মা তোমার সাথে অনেক দিন দেখা হয়না, মনে হয় তোমার চুলগুলো বড় হয়ে গেছে। তুমি যদি আমার সেলুনে আস তবে ২৫% কমিশনে তোমার চুলগুলো কেটে দেব। এ ধরনের যান্ত্রিক সম্পর্কের কারণে পাশ্চাত্যে বেশী পরিমাণ বৃদ্ধাশ্রম তৈরি হচ্ছে। আর সেখানে মা বাবাদের মৃত্যু হওয়ার ১/২ সপ্তাহ পর পুলিশ এসে দরজা ভেংগে তাদের লাশ উদ্ধার করে থাকে। পাশ্চাত্যে সন্তানদের সংশ্রব থেকে মাহরুম মা বাবা নিজে সন্তানের নামে চিঠি লিখে নিজ ঠিকানায় পোস্ট করে নিজেকে সান্ত্বনা দানের বৃথা চেষ্টা করে থাকেন।

১৯৪৮ সালের ১০ জানুয়ারী জাতিসংঘ কর্তৃক সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়া হয়। এতে মানব জীবনে কতিপয় অথবা অনেকগুলি বিষয়কে অন্তর্ভূক্ত করা হলেও সকল বিষয়কে এর মধ্যে শামিল করা হয়নি। আবার যা কিছু তারা শামিল করেছে এর পুরোপুরি তারা বাস্তবায়ন করতে রাজি নয় অথবা তারা নিজেরা অহরহ এর লঙ্ঘন করে চলেছেন। অথচ ইসলাম মানবাধিকারের বিষয়ে আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত করেছে এবং একই সাথে তার পরিপূর্ণ বাস্তবায়ন করেছে এর কারণ যদি আমরা খোঁজ করি তবে আমাদের কাছে যে বিষয়াবলী এসে ধরা দেয় তা হল- “ইসলাম আল্লাহর সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে আল্লাহকে তাবৎ পৃথিবীর স্রষ্টা ও মালিক হিসেবে মানে। আবার তারা এও বিশ্বাস করে স্রষ্টার আদেশ নিষেধ না মানলে তাকে একদিকে যেমন জবাবদিহি করতে হবে অন্যদিকে পরকালে তাকে কঠিন ও কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে। মানুষ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি

হিসেবে তার দায়িত্ব হল এ পৃথিবীতে আল্লাহর আইন বা বিধান মোতাবেক চলতে হবে। তার পথের পথ প্রদর্শক হলেন, মানবতার মুক্তির দূত হযরত মুহাম্মদ (স.)।

পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে। আল্লাহ শিরক ব্যতিত অন্যান্য গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন কিন্তু তিনি অপরের অধিকার লংঘনকারীকে মাফ করবেন না। অতএব কেবল মাত্র মানুষ নয় পশু-পাখির অধিকার সংরক্ষণের বিষয়েও ইসলাম যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক মহিলা কর্তৃক এক বিড়ালকে খেতে না দিয়ে বেঁধে রাখায় বিড়ালটি মারা যাওয়ায় রাসূল (সা.) মহিলাটিকে জাহান্নামি বলে আখ্যায়িত করেছেন। আবার একজন মহিলা কর্তৃক একটি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর কারণে রাসূল (সা.) বলেছেন, সে জান্নাতি।

পাশ্চাত্যের মানবাধিকারীরা যেহেতু বস্তুবাদে বিশ্বাসী অতএব তাদের নিকট নিজের স্বার্থই বড়। পরকালের জবাবদিহিতা এমনকি দুনিয়ার জবাবদিহিতার বিষয়টিও গৌণ। তাদের দর্শন হলো- “নগদ যা পাও হাত পেতে নাও বাকীর খাতায় শূন্য থাক” অথবা “দুনিয়াটা মস্ত বড় খাও দাও ফুর্তি কর।” তাছাড়া এদের নিকট অধিকারের বিষয়টি অনেক বড় কিন্তু দায়িত্ব বা কর্তব্যের বিষয়টি তত বড় নয়। এ কারণে তারা দেখে ভিকটিম তাদের মতাদর্শের কিনা? যদি তাদের ঘরানার না হয় তবে সে ক্ষেত্রে তারা চুপসে যায়। অথচ এ বিষয়ে পবিত্র কোরআন পরিষ্কার করে বলে দিয়েছে- “তোমরা ন্যায় বিচার কর যদিও সে তোমার নিকটাত্মীয় হোক”। বিচারে যদি তোমার নিকটাত্মীয়ও ঠকে তবে তাতে যেন তুমি পিছপা না হও। তোমরা ন্যায় বিচার কর একটি তাকওয়ার (খোদাভীরুতার) নিকটবর্তী। মহানবী (সা.) বরেছেন- “যদি আমার মেয়ে ফাতেমাও চুরি করে তাহলেও আমি তার হাত কেটে দিব। হযরত উমর রা. নিজ পুত্রকে মদ পানের অপরাধে স্বহস্তে বেত্রাঘাত করে সে নজিরই রেখে গেলেন দুনিয়াবাসীর সামনে।

আমাদের সমাজে নারীবাদী ও মানবাধিকারের কর্মীদেরকে একচোখা নীতি গ্রহণ করতে দেখা যায়। তারা দিনাজপুরের নূরজাহানকে পুলিশ কর্তৃক ধর্ষণের পর হত্যার কারণে এত কঠোর আন্দোলন করেন যে এতে সরকারেরও পতন পর্যন্ত ঘটেছে। অথচ সীমা চৌধুরী নামক নও মুসলিমকে ধর্ষণের পর আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হলেও কোন আন্দোলনতো দূরে থাক কোন কথাও তাদের বলতে শুনা যায়নি। এখানেই ইসলাম ও বস্তুবাদী পাশ্চাত্যের অনুসারীদের পার্থক্য। এ কারণে ইসলামের মানবাধিকার সার্বজনিন, পূর্ণাঙ্গ ও সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়িত হয়ে থাকে। আর বস্তুবাদীদের মানবাধিকার বাস্তবের চেয়ে কথায় বেশী শোভা পায়।

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক রাষ্ট্রবিজ্ঞান, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়

বিজ্ঞানের খবর

১০ কোটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিয়ে আসছে সৌরঝড়

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বানী করে বলেছেন, ২০১২ সালে ১০ কোটি হাইড্রোজেন বোমার শক্তি নিয়ে একটি সৌরঝড় আঘাত হানবে আমাদের গ্রহ এই পৃথিবীকে। ইতিমধ্যে গত কয়েকদিনে সূর্যের উপরের পৃষ্ঠে কয়েকটি বিশাল বিস্ফোরন ঘটেছে। এতে করে সৌরঝড়ে আগামী কয়েকদিনে পৃথিবী ব্যাপী স্যাটেলাইট, টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটার আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূর্য থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়া মৌলিক কণার স্রোত বা সৌরবায়ু পৃথিবীর আয়ন মণ্ডলে আঘাত হানার কারণে এ বিপত্তি দেখা দিতে পারে।

এই কারণে যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যেই স্যাটেলাইট, টেলিযোগাযোগ ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম বা যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সমুদ্র ও বায়ুমণ্ডল প্রশাসনের মহাশূন্য আবহাওয়া কেন্দ্রের বিজ্ঞানী যোসেফ কানচেস বলেন, আসন্ন এ সৌরঝড় মাঝারি থেকে মক্তিশালী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তিনি জানান, সৌরঝড়ের প্রভাব পড়বে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম (জিপিএস) স্যাটেলাইটে। ফলে পৃথিবীতে স্যাটেলাইট নির্ভর যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। সৌরবায়ুর কারণে পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণের মেরুবর্তী অঞ্চলে মেরু জ্যোতিও দেখা দিতে পারে বলে জানান বিজ্ঞানী কানচেস। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপরিস্তরের পরমাণুর সঙ্গে সৌরবায়ু বাহিত উত্তপ্ত মৌলিক কণার সংঘর্ষে সৃষ্টি হয় মেরুজ্যোতি। এতে মেরু সংলগ্ন এলাকাগুলো থেকে রাতের আকাশে বিস্ময়কর আলোর নাচন দেখা যায়। সূর্যে সংঘটিত কোনকিছুর প্রভাব পৃথিবীতে পড়া বিরল ঘটনা। তবে অতীতে এমন ঘটনা ঘটার নজির আছে। ১৯৮৯ সালে সৌরঝড়ের প্রভাবে কানাডার কুইবেক প্রদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। এতে কয়েক ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের দুর্ভোগে পড়ে কুইবেকের ৬০ লাখ মানুষ। এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সৌরঝড় রেকর্ড করা হয়েছে ১৮৫৯ সালে। তখন পৃথিবীর যোগাযোগ ব্যবস্থা টেলিগ্রাফেই সীমাবদ্ধ ছিল। সৌর ঝড়ের কারণে পৃথিবীব্যাপী টেলিগ্রাফ কার্যালয়গুলো অচল হয়ে পড়ে।

পৃথিবীকে ঘিরে রেখেছে এন্টিম্যাটার

পৃথিবীকে মুড়িয়ে রেখেছে এন্টিম্যাটার বা প্রতিবস্তুর কণার একটি বলয়। বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মত এন্টিপ্রোটন নামের এই বলয় আবিষ্কার করেছেন। ২০০৬ সালে মহাকাশে পাঠানো কৃত্রিম উপগ্রহ পামেলার মাধ্যমে এ বলয়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের আড়ালে এন্টিম্যাটারের অস্তিত্ব থাকতে পারে বলে আগেই ধারণা করা হয়েছিল। পামেলার মাধ্যমে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে। নতুন আবিষ্কৃত এন্টিম্যাটার দিয়ে ভবিষ্যতে নভোযানের উৎকৃষ্ট জ্বালানি তৈরি করা সম্ভব হবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা প্রকাশ করেছেন। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার বিজ্ঞানীরা বলছেন, সূর্যের উচ্চ শক্তির কণার প্রকৃতি এবং আমাদের সৌরজগতের শক্তি বা আলোক রশ্মির উৎস কি তা জানতে মহাকাশে পামেলা নামের এই কৃত্রিম উপগ্রহ পাঠানো হয়। এটি ভ্যান এলেন বলয়ের মাঝে 'স্বাভাবিক' বস্তুর আড়ালে স্বল্পসংখ্যক এন্টি প্রোটনের সন্ধান পেয়েছে। আর তাতে সেখানে ওই কণা প্রচুর পরিমাণে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, এন্টিপ্রোটনের কণা বা তাদের সৃষ্ট স্বজাতীয় কণারই অস্তিত্ব পাওয়া গেছে ভ্যান এলেন বলয়ে। এসব কণা ভেঙ্গে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণার আকার ধারণ করে পৃথিবীর পরিমণ্ডলে থাকা কণার সঙ্গে সংঘর্ষের নীচে নেমে আসতে পারে বলেও আশংকা করা হচ্ছে। এস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নাল লেটারস নামের একটি সাময়িকীতে এ গবেষণা প্রতিবেদনে প্রকাশ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের অন্যতম

বিজ্ঞানী ইতালীর বারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আলেসান্দ্রো ব্রুনো বলেন, পৃথিবীর অতি কাছে আবিস্কৃত এ বললে প্রচুর পরিমাণে এন্টিপ্রোটন রয়েছে।

মহাশূন্যে অক্সিজেন

মহাশূন্যে অক্সিজেন অণুর অস্তিত্ব পাওয়া গেছে বলে দাবি করেছেন বিজ্ঞানীরা। তারা বলেছেন, হার্শেল স্পেস টেলিস্কোপের ক্যামেরায় মহাকাশের ওরিয়ন গ্রহাণুতে অক্সিজেন অণু ধরা পড়েছে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়ামের পরই মহাবিশ্বের অক্সিজেনের সবচেয়ে আধিক্য রয়েছে। ইউরোপীয় মহাকাশ সংস্থা জানায় তারা মহাশূন্যে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন থাকার প্রমাণ পেয়েছেন। মহাশূন্যে এই অক্সিজেনে অণু আকারে জমাটবদ্ধ রয়েছে। এর আগে পৃথিবীর বাইরে মহাশূন্যের অন্য কোথাও অক্সিজেন অণুর উপস্থিতি ধরা পড়েনি।

পৃথিবীর উত্তরাংশের মানুষের মস্তিষ্ক ও চোখ বড়!

পৃথিবীর উত্তর অংশে বাস করা মানুষের মস্তিষ্ক ও চোখের আকার অন্যান্য অংশের তুলনায় বড়। অনুজ্জ্বল আকাশ ও ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে গিয়ে বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের মস্তিষ্ক ও চোখের আয়তনের এ বৃদ্ধি ঘটেছে। সম্প্রতি যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা এ তথ্য পাওয়ার কথা দাবি করেন। বায়োলজি লেটার্স সাময়িকীতে এ গবেষণা বিষয়ক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। গবেষণায় নেতৃত্ব দেন অক্সফোর্ড স্কুল অব এনথ্রোপমজির আইনুলত পিয়ার্স। গবেষকরা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের ১২টি জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে ৫৫টি মাথার করোটি নিয়ে গবেষণা করেন। আঠারা শতক থেকে অক্সফোর্ড ও ক্যামব্রিজের জাদুঘরে এসব করোটি সংরক্ষণ করা হয়। গবেষণায় দেখা যায় অন্য এলাকার মানুষের তুলনায় পৃথিবীর উত্তর অংশের মানুষের মস্তিষ্ক ও চোখের আকার বড়। পিয়ার্স বলেন, উত্তরের দিকে এগোলে ধীরে ধীরে আলো কমতে থাকে।

মঙ্গল গ্রহে পানি থাকার প্রমাণ মিলেছে

মঙ্গলগ্রহের পাহাড়ী ঢালে লবণাক্ত পানি প্রবাহ থাকতে পারে বলে প্রমাণ পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা। বিষয়টি নিশ্চিত হলে সৌর জগতের লাল এই গ্রহটিতে প্রথমবারের মত তরল পানির সন্ধান মিলবে। সেই সঙ্গে মঙ্গলে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার সম্ভাবনা প্রবল হবে। মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা সম্প্রতি এই তথ্য জানায়। রহস্যময় গ্রহ মঙ্গল সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে নাসার পাঠানো মার্স রেকনিস্যান্স অরবিটর তরল পানির অস্তিত্ব সম্পর্কে এ তথ্য পাঠিয়েছে। নাসার মার্স এক্সপ্লোরেশন কর্মসূচীর প্রধান বিজ্ঞানী মাইকেল মেয়ার সাংবাদিকদের বলেন, মঙ্গলে পানির প্রবাহ থাকার পক্ষে বারবার ও পূর্বানুমানযোগ্য তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। নাসা জানায় ২০০৬ সাল থেকে মঙ্গল গ্রহকে পরিক্রমাকারী অরবিটর দৃশ্যত মঙ্গলের বেশ কয়েকটি স্থানে পানির প্রবাহ চিহ্নিত করেছে।

মহাশূন্যে বিশাল পানির ভাণ্ডার!

মহাশূন্যে বিশাল একটি পানির ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছেন মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা। এতে পৃথিবীর সব মহাসাগরের চেয়ে অন্তত ১৪০ ট্রিলিয়ন গুণ বেশি পানি রয়েছে বলে তারা দাবি করেছেন। গবেষকদের দুটি দল বলছে মহাবিশ্বে আবিষ্কৃত সবচেয়ে দূরের পানির ভাণ্ডার এটি। নতুন সন্ধান পাওয়া এই জলাধারটি পৃথিবী থেকে ১ হাজার ২শ' আলোকবর্ষ দূরের একটি কৃষ্ণগহ্বরকে ঘিরে রেখেছে। একটি বিশাল আকৃতির কৃষ্ণগহ্বর বেষ্টিত কোয়াসার চারপাশের গ্যাস ধূলাবালি চুষে নেয়। গবেষকরা এপিএম ০৮২৭৯+৫২৫৫ নামের ওই কোয়াসার নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা চালিয়ে আসছেন। কৃষ্ণ গহ্বরটি সূর্যের চেয়ে ২ হাজার গুণ বড়। এক পর্যায়ে তারা ওই কৃষ্ণ

গহ্বরটির চারপাশের বাষ্পীভূত পানির অস্ড়িত্ব খুঁজে পান। দুটি গবেষক দল এ গবেষণায় অংশ নেয়। একটির নেতৃত্বে ছিলেন নাসার বিজ্ঞানী ম্যাট ব্রাডফোর্ড। তিনি বলেন, কৃষ্ণ গহ্বরটির চার পাশের আবহাওয়া অনন্য ধরনের যা বিপুল পরিমাণে পানি উৎপন্ন করছে। জলাধারটির অস্ড়িত্ব প্রথমে আবিষ্কার করেন ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজির গবেষক পদার্থ বিজ্ঞানী ডারিউজ লিস ও তার সহযোগীরা।

পৃথিবীর দু'টি চাঁদ ছিল!

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি তাদের একটি গবেষণায় জানিয়েছেন, পৃথিবীর এক সময় দু'টি চাঁদ ছিল। বর্তমানে রাতের আকাশে দেখতে পাওয়া চাঁদটি সেই দু'টি চাঁদের একটি। আকারে তুলনামূলক ছোট আরেকটি চাঁদ ধ্বংস হয়ে গেছে। চাঁদের জন্ম সম্পর্কে সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মহাকাশ গবেষক এরিক এসফাস ও তার সহকর্মীরা নতুন এ তথ্য জানান। বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল জানিয়ে বলেন, চাঁদ দু'টির সংঘর্ষ হয়েছে অত্যন্ড় ধীরগতিতে। একই কক্ষ পথে দুটি চাঁদ অবস্থান করেছে প্রায় ৮ কোটি বছর। রঙ এবং গঠনে দু'টি চাঁদ প্রায় একই রকম ছিল। কিন্ড়ু ধ্বংস হয়ে যাওয়া চাঁদটি ছিল বর্তমানটির প্রায় এক তৃতীয়াংশ।

প্রস্ড়র যুগে অনেক সুড়ঙ পথ ছিল

সম্প্রতি জার্মান প্রত্নতাত্ত্বিক ও গবেষক ড: হেনরিক কুস তার 'সিক্রেটস অব দ্য আন্ডারগ্রাউন্ড টু এ্যান এনসিয়েন্ট ওয়ার্ড, গ্রন্থে প্রস্ড়র যুগের অগণিত সুড়ঙ্গের অস্ড়িত্ব প্রকাশ করেছেন। তার গবেষণায় প্রস্ড়র যুগীয় মানুষের ইউরোপ থেকে স্কটল্যান্ড হয়ে তুরস্ক যাওয়ার গোপন সুড়ঙ্গ পথের সন্ধানও মিলেছে। জার্মানীর ব্যাভারিয়াতে সাতশ মিটার-এর অস্ট্রিয়া স্টিরিয়াতেও এরকম তিনশ' মিটার গোপন পথের সন্ধান পাওয়া গেছে। সর্বোচ্চ ৭০ সেন্টিমিটার চওড়া পথগুলোর সংখ্যা ইউরোপ জুড়ে এক হাজারের বেশি। অনেকের ধারণা বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যই বিকল্প ব্যবস্থা ছিল এটি।

সংগ্রহে : মোহাম্মদ এনায়েত উল□হ

ইসলামে হালাল-হারাম

মাওলানা আবদুর রহীম

ধুমপানের এত ক্ষতিকর দিক যা এক কথায় সষ্টরিত্রবান আদর্শ মানুষ হওয়াকে বাধাগ্রস্থ করে এবং কুরআন-হাদীস মোতাবেক এগুলো বিস্তারিত আলোচনা থেকে যা প্রতীয়মান হয় তা হলো এটি হারাম। এটি সষ্টরিত্রবান আদর্শ মানুষ হতে হলে অবশ্যই পরিত্যাজ্য বা এটি ত্যাগ করা, এটি থেকে মুক্ত থাকা সষ্টরিত্রবান মানুষ হওয়ার পূর্বশর্ত। আর এ দিকে লক্ষ্য রেখেই বিশ্বের অন্যতম দরিদ্রদেশ বাংলাদেশ সিগারেট উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান থেকে কোটি কোটি টাকা ইনকাম ট্যাক্স ও ভ্যাট আকারে আয় হওয়া সত্ত্বেও একবিংশ শতাব্দির বাংলাদেশ ও দেশের মানুষকে আদর্শ জাতি হিসেবে গঠন করার লক্ষ্যে আমাদের জাতীয় চরিত্রকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন পাশের মাধ্যমে তা বন্ধ করার এক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ঘোষণা করেছে প্রকাশ্যে ধুমপান নিষেধ। কিন্তু তবু ধুমপায়ীরা কতটা বিবেক বর্জিত আর বিকৃত রুচির মানুষ তারা এখন বাথরুমে গিয়ে সিগারেট টানে একটা নয় একসাথে দু-দুটি। ফলে পাবলিক টয়লেটে ও রেলওয়ের টয়লেটে দুর্গন্ধের জন্য বসা যায়না। পায়খানার গন্ধকেও হার মানায় এ গন্ধ। সুতরাং বুঝতেই পেরেছেন এ কেমন মহা দুর্গন্ধ।

ধুমপান থেকে মুক্তির উপায়/করণীয়

এক: বাবা ধুমপান করলে সন্তান ধুমপায়ী হয় কাজেই বাবা অতীতে ধুমপান করে থাকলেও সন্তান জন্মলাভ করার পর আর না করা উচিত। তা না হলে দেখবেন আপনার প্যাকেটের সিগারেট চুরি, পকেটের টাকা চুরি হচ্ছে রীতিমত আর আপনি হচ্ছেন চোর গঠনকারী চোরের রক্ষক আরেকটু এগিয়ে চোরের বাবা।

দুই: ধুমপান করে এ সকল বন্ধুদের সংগ ত্যাগ করা।'

তিন: অবাধে টাকা-পয়সা ছাত্র জীবনে সন্তানদের হাতে না দেয়া।

চার: পরিবারে মা-বাবার মধ্যে ঝগড়া বিবাদ সৃষ্টি না হওয়া- এতে সন্তানদের টেনশনমুক্ত থাকার নামে বাসার বাইরে চায়ের দোকানে বাজে বন্ধুদের সাথে আড্ডাতে অভ্যস্ত হয়ে পড়বে।

পাঁচ: এমন কোন সংগঠনের আওতাভুক্ত না হওয়া যে সংগঠন প্যাকেট প্যাকেট সিগারেট দিয়ে কিশোর ও যুবকদেরকে সংগঠনের পক্ষে প্রচারের কাজে নিয়োগ রাখতে চায়।

পরিশেষে বলা যায়, ধুমপান ত্যাগ করার জন্য স্ব স্ব ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তিই যথেষ্ট। আপনি যদি বলেন, আমার অভ্যাস হয়ে গেছে, আমি অতিতেও চেষ্টা করেছি কিন্তু ছাড়তে পারছি না। তখন আপনাকেই বলব, মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব। মানুষ পারেনা এমন কিছু কি পৃথিবীতে আছে? তাছাড়া অভ্যাস আপনার চাকর না, আপনি অভ্যাসের চাকর। অভ্যাস আপনার অধীন না আপনি অভ্যাসের অধীন। অভ্যাস আপনার দ্বারা পরিচালিত হবে না আপনি অভ্যাস দ্বারা পরিচালিত হবেন।

এবার যদি আপনি বলেন আপনি অভ্যাসের চাকর, এভাবেই চিন্তা করলে আপনি মানুষ কিনা তা ভাবতে অবাক লাগবে। হয়তোবা আপনি দেহ অবয়বে নিজকে মানুষ বলবেন, বিবেক সঠিকভাবে কাজে না লাগানোর দায়ে পরিপূর্ণ মানুষ হওয়া যায়নি। (চলবে)

রমজান উত্তর স্বাভাবিক জীবন

ডা: মো: মোয়াজ্জেম হোসেন এফআরসিপি

সিয়াম সাধনার মাস পবিত্র রমজান। শরীর-মন, অন্তর-আত্মা পরিশুদ্ধ হয় রমজানে। বছরের অবশিষ্ট এগার মাস পরিচালিত হবে একমাসের প্রশিক্ষণের আলোকে। এই সময়ে দিনের বেলায় আহার করা থেকে বিরত থাকায় আমাদের শরীর রূপযন্ত্রের পরিশুদ্ধি ঘটে। তদ্রূপ মন-মানসিকতারও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কেউ যদি রমজানের দিনের বেলায় খেলোনা বলে রাতে সারা দিনেরটা উসুল করে নেয়, এতে করে ব্যক্তি তার দেহরূপ যন্ত্রের উপর জুল্‌ম করল। পেটের পীড়া, এসিডিটি, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি নানা রকম রোগে ভুগে রমজানে যেমন কষ্ট পেল। রমজানের পরও শারীরিক দুর্বলতায় ভুগতে থাকে।

রমজানের প্রস্তুতি শুধু খুৎ-পিপাসায় কষ্ট পাওয়া নয়। বরং শরীর-মন-মানসিকতার উপর খোদার নির্দেশকে পরিপূর্ণ বলবৎ করা। তার জন্য রোজা শেষ হওয়ার সাথে সাথে যদি সব ক্ষেত্রে পূর্ববত বেহিসাবী আচরণ শুরু করে দেন তা শরীর-মন-সমাজ কারও জন্য কল্যাণকর হবে না।

রোজার শেষে খাদ্যাভ্যাস ধীরে ধীরে পরিবর্তন করা উচিত। রমজানে আপনি ঝাল-তেল-মসলা কম খেয়েছেন। রোজার পরও আস্তে আস্তে এই সবের প্রতি অভ্যস্ত হউন। এইজন্য ঈদুল ফিতরে আমরা সাধারণত মিষ্টান্নের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকি। এমনকি ঈদের জামাতে যাওয়ার আগে ফিরনী-পায়েস সেমাই একটু গ্রহণ করা সুন্নত।

আমাদের সামাজিক জীবনে অনেক সময় এর ভিন্ন চিত্র দেখা যায়। ঈদের দিনেই হাজার রকম গুরুপাক খাবার যেমন পোলাও, বিরিয়ানী, রোস্ট, ইত্যাদির পসরা বসে যায়। অভিজাত হোটেলগুলোতেও চলে খাবারের প্রতিযোগিতা। হঠাৎ করে একমাসের বিরতিতে পেট এত সব খাবার সহজভাবে হজম করতে পারে না। শুরু হয় পেটের পীড়া, ডায়রিয়া, ডিসেন্ট্রি, এসিডিটি, গ্যাস ইত্যাদি। পরিণামে ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল ছুটাছুটি শুরু হয়ে যায়। আমাদের উচিত রমজানের পরও কম ঝাল-তেল-মসলাযুক্ত খাবার গ্রহণ করা। অতিরিক্ত ভোজন বর্জন করা। পরিমাণে একটু কম খাওয়া। তরল খাবার, ফল-ফলাদী বেশী করে খাওয়ার চেষ্টা করা।

শরীর মন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মনকে যদি রমজানের পরই আবার আগের মত বানিয়ে ফেলেন, তাহলে শরীরও ভাল থাকবে না। লক্ষ্য রাখতে হবে রমজানের প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে কাজে লাগাতে না পারলে এই রমজান আপনার জীবনে কোন কাজেই আসল না। কেউ রমজানের আগে মদ খেত, রমজানে ছাড়ল কিন্তু রমজানের পরে আবার শুরু করে দিল। না রমজান তার জীবনে কোন পরিবর্তনই আনতে পারল না। রোজার আগে মিথ্যা কথা বলত, রমজানে ছাড়ল কিন্তু রমজানের পরে আবার শুরু করল, না এতে রমজান তার কোন কাজেই এল না।

স্বভাব-চরিত্র, খাবার-দাবার, মন-মানসিকতার যখন ব্যক্তি পুরো বছরটায় একজন রোজদারীর মতই চলতে অভ্যস্ত হবে তবেই সিয়ামের সার্থকতা। ঈদুল ফিতরের আনন্দ একজন মুমিনের জীবনে তখনই সার্থক হবে যখন তিনি সিয়াম পালনে নিষ্ঠাবান হবেন, জীবনে সমস্ত গুনাহ মুক্ত হয়ে নতুন করে জীবন শুরু করতে পারবেন। কোন এক ঈদুল ফিতরের দিনে হযরত ওমর (রা.)কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। দেখা গেল তিনি মসজিদে নববীর এক কোণে বসে কাঁদছেন। সাহাবাগণ বললেন- হে আমীরুল মু'মিনীন আজ খুশীর দিনে আপনি কাঁদছেন? অথচ আমরা নামাজ পড়ানোর জন্য আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। হযরত ওমর (রা.) বললেন, 'হে ভাইয়েরা, রোজা তো শেষ হয়ে গেল, কিন্তু আমি তো জানতে পারলাম না রাব্বুল আলামীন আমার গুনাহ মাফ করেছেন কিনা। না হলে আমি ঈদের আনন্দ করবো কি করে! আসুন আমরা আমাদের জীবনেও রমজানের এই শিক্ষাকে যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে পুত-পবিত্র জীবন গড়ে তুলি। দেহ-মনের সাথে সাথে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনও সুন্দর ও সার্থক হয়ে উঠুক।

চেম্বার : মেডিনোভা, ৫/এ, ধানমন্ডী, ঢাকা।

জবাব দিচ্ছেন
মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

মোঃ এনামুল হক, ঢাকা

প্রশ্ন-১. কেউ কেউ বলে থাকেন দাড়ি কামানো কবীরাহ গুনাহ। কথাটি কি সঠিক?

উত্তরঃ এভাবে ফতোয়ার ভাষায় কথা বলা আমরা ঠিক মনে করি না। আর কোরআন হাদীসে এভাবে বলাও হয়নি যে দাড়ি কামানো কবীরাহ গুনাহ। দাড়ি রাখাটা একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। তবে কেউ যদি দাড়িকে অবজ্ঞা করে দাড়ি রাখা থেকে বিরত থাকে তাহলে সেটা কবীরাহ গোনাহের পর্যায়ে পড়ে। আর মূল কথা হলো কোন ফরজ ছেড়ে দিলে সেটা কবীরাহ গোনাহ। ফরজ নয় এমন কিছু পালন না করলে সেটা কবীরাহ গোনাহের পর্যায়ে পড়ে না।

নাহার বেগম, কুমিল্লা

প্রশ্ন-২. অযু করার শেষ পর্যায়ে বায়ু নির্গত হলে কি পুনরায় অজু করতে হবে?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ, এরকম হলে আবার অজু করতে হবে।

প্রশ্ন-৩. কোন টাঙ্গানো ছবির সামনে নামাজ পড়লে নামাজ হবে কি?

উত্তরঃ ছবি ইসলামের কালচার নয়। ছবির সামনে নামাজ না পড়া উচিত। নামাজের সময় ছবি উল্টিয়ে রাখা উচিত।

প্রশ্ন-৪. গাইনি ডাক্তার স্বাস্থ্যগত কারণে আমার চতুর্থ বাচ্চাকে প্রসবের পরে লাইগেশন করতে বলেছেন। কারণ আগের ৩টি বাচ্চাই সিজার করা। এমতাবস্থায় লাইগেশন করা যাবে কি?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ, যদি আপনার জীবন বিপন্ন হওয়ার আশংকা থাকে তাহলে এমতাবস্থায় আপনাকে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে চলতে হবে।

কামাল হোসেন, সৌদি আরব

প্রশ্ন-৫. সৌদি আরব থেকে আমাদের দেশে যে কোরবানীর গোশত আসে সেগুলো খাওয়া কি হালাল?

উত্তরঃ জ্বি হ্যাঁ, সৌদি আরবের কোরবানীর গোশত খাওয়া হালাল।

প্রশ্ন-৬. কোরবানীর গোশত খাওয়ার নিয়ম আড়াই দিন কথাটি কি কোরআন হাদিস সম্মত?

উত্তরঃ জ্বি না, এ ধরনের কথা কোরআন হাদিসে নেই। কোরবানীর গোশত খাওয়ার ব্যাপারে কোন সময় সীমা নির্ধারণ করে দেয়া নেই।

আবীদ আলী, যশোর

প্রশ্ন-৭. মুকীম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে জামাতে শরীক হওয়া থেকে বিরত থাকতে পারবে কি?

উত্তরঃ মুকীম অবস্থায় জামায়াতে শরীক হওয়া জরুরী ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ দেওয়া উচিত নয়।

প্রশ্ন-৮. যাকাতের অর্থ গরিব আত্মীয়-স্বজন বা ভাই-বোনদের দেয়া যাবে কি?

উত্তর: গরিব আত্মীয়-স্বজন যাকাত পাওয়ার যোগ্য হলে যাকাত দেয়া যাবে। তবে বাবা-মা, ভাই-বোন এমন আত্মীয়-স্বজন যাদের ভরণপোষণের দায়িত্ব আপনার উপর তাদের যাকাত দেওয়া যাবে না। তবে যদি ভাই বোন তাদের আলাদা সংসারে থাকে তারা গরিব হলে তাদের যাকাত দেয়া যাবে।

প্রশ্ন-৯. যানবাহনের মধ্যে নামাজ পড়তে গেলে অনেক সময় দাঁড়ানো যায়না ক্বিবলামুখী হওয়া যায় না। এমতাবস্থায় কিভাবে নামাজ আদায় করব?
উত্তর: যানবাহনে এমতাবস্থায় আপনি বসে ক্বিবলামুখী না হয়েও নামাজ আদায় করতে পারবেন। যেদিকে মুখ ফিরানোর সুযোগ থাকে সেদিকে মুখ ফিরিয়ে নামাজ আদায় করলে নামাজ হয়ে যাবে।

মকবুল হোসেন, ঢাকা
প্রশ্ন-১০. সেজদায় গিয়ে ৩ বার সোবহানা রাব্বিয়াল আলা পড়ার পরে নিজের ইচ্ছামত দোয়া করা যাবে কি?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, সেজদায় গিয়ে নিজের ইচ্ছামত দোয়া করা যাবে। তবে মুখে উচ্চারণ না করে মনে মনে করতে হবে।

প্রশ্ন-১১. ছেলে এবং মেয়েদের সাবালক হওয়ার বয়স কত?
উত্তর: বালেগ হওয়ার ক্ষেত্রে ছেলেদের বিশেষ কিছু লক্ষণ প্রকাশ পেতে হবে যেমন- দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পেলেই বালেগ হয়েছে বোঝা যায়। আর মেয়েদের মাসিক শুরু হওয়াই বালেগ হওয়ার লক্ষণ। আমাদের দেশে সাধারণত মেয়েদের বালেগ হতে ১২-১৩ বছর লাগে। আর ছেলেদের ১৪-১৫ বছর।

প্রশ্ন-১২. কত বছর বয়স থেকে ধর্মীয় বিধান ফরজ হয়?
উত্তর: বালেগ হলেই ধর্মীয় বিধান ফরজ হয়ে যায়।

প্রশ্ন-১৩. মানুষের জন্ম-মৃত্যু কি নির্ধারিত?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, মানুষের জন্ম-মৃত্যু নির্ধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু অতায়ালা সব কিছুই জানেন। কোন কিছুই তার অজানা নয়। তিনি ইলমের দ্বারাই সবকিছু নির্ধারণ করে রেখেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-১৪. কাপড়ে নাপাকি বস্তু লাগলে সেটি কিভাবে ধৌত করলে পাক হবে?
উত্তর: যে নাপাকি কাপড়ে লেগে শুকিয়ে যুক্ত হয়ে যায় যেমন বীর্য ইত্যাদি এ সকল নাপাকি শক্ত হওয়ার পরে ভালো করে হাত দিয়ে রগড়িয়ে ছুটিয়ে ফেললেই কাপড় পরিষ্কার হয়ে যাবে। আর পেশাব জাতীয় নাপাকি পানি দিয়ে ৩ বার ধুয়ে ফেলতে হবে। প্রতিবার ধোয়ার পরে ভালো করে নিংড়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন-১৪. কোরবানীর পশু জবেহ করার বিনিময়ে টাকা নেওয়া জায়েজ কি?ঃ
উত্তর: কোরবানীর পশু নিজ হাতে জবেহ করাটাই উত্তম। তবে অন্য কোন মুসলিমকে দিয়ে জবেহ করালে তাকে হাদিয়া দেয়া যেতে পারে। এটা নাজায়েজ নয়।

প্রশ্ন-১৬. ফরজ গোসলের পরে নামাজের জন্য কি আবার অজু করতে হবে? নাকি ফরজ গোসল করলেই চলবে।
উত্তর: ফরজ গোসল আদায় করলেই নামাজ পড়া যাবে নামাজের জন্য আবার অজু করতে হবে না।

প্রশ্ন-১৭. আমার কর্মস্থল থেকে গ্রামের বাড়ি যাওয়ার পথে রাস্তায় কি কছর নামাজ পড়া যাবে?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, যদি আপনার কর্মস্থল থেকে গ্রামের বাড়ির দূরত্ব ৪৮ মাইল বা তার বেশী হয় তাহলে পথিমধ্যে আপনাকে কসর পড়তে হবে।

ছালমা আকতার, নারায়ণগঞ্জ
প্রশ্ন-১৮. স্বামী স্ত্রী দু'জনে মিলে জামাত করে নামাজ আদায় করা যাবে কি?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী মিলে জামাত করে নামাজ পড়া যাবে। এক কাতার বা এক সারি আগে পিছে করে দাঁড়াতে হবে এবং স্বামী ইমামতি করবেন। পাশাপাশি দাঁড়ানো ঠিক হবে না।

প্রশ্ন-১৯. মৃত ব্যক্তির নামে কোরবানী দিলে সেই গোশত কি সকলেই খেতে পারবে নাকি পুরোটাই গরিবকে দিয়ে দিতে হবে?
উত্তর: কোরবানীর গোশত সবাই খেতে পারবে। সদকাহ দিলে কেবলমাত্র সেই গোশত গরিবকে বিলিয়ে দিতে হয়। আর মৃত ব্যক্তির জন্য সদকাহ করাই উত্তম কোরবানীর পরিবর্তে। কারণ কোরবানী হচ্ছে ওয়াজিব আর মালদার ব্যক্তির উপরেই কোরবানীর হুকুম বর্তায়।

প্রশ্ন-২০. আমার ছেলের নাম পরিবর্তন করতে চাই এজন্য কি আক্বীকাহ দিতে হবে?
উত্তর: জ্বি না, নাম পরিবর্তনের জন্য আক্বীকাহ দেয়ার প্রয়োজন হয় না। আক্বীকাহ একবার দিলেই হয়।

প্রশ্ন-২১. স্ত্রীকে বেহেশতে যেতে হলে নাকি তার স্বামীর লিখিত অনুমতি লাগবে একথা কি কোরআন হাদীসে আছে?
উত্তর: জ্বি না, এ ধরনের কোন কথা কোরআন হাদিসে নেই। এটা অজ্ঞতা প্রসূত কথা, ভিত্তিহীন কথা।

প্রশ্ন-২২. মহিলাদের সাদাস্রাব কি নাপাক? এটা কাপড়ে লাগলে কি সেই কাপড় পরে নামাজ পড়া যাবে?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ। মহিলাদের সাদাস্রাব বা লিকুরিয়া নাপাক। সাদা স্রাবযুক্ত কাপড় পরে নামাজ হবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-২৩. আমার স্বামী বলে থাকেন যে তার শাশুড়ি অর্থাৎ আমার মায়ের প্রতি তার কোনো দায়িত্বই নেই। কথাটি কি ইসলাম সম্মত?
উত্তর: জ্বি না, কথাটি ইসলাম সম্মত নয়। শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যাপারে ইসলামে তাকিদ দেয়া হয়েছে। স্বামীর দায়িত্ব হচ্ছে সংগতি অনুযায়ী সাধ্যমত শ্বশুর শাশুড়ির প্রতি কর্তব্য পালন করা, স্ত্রীরও দায়িত্ব তার শাশুড়ির খেদমত করা। এ ক্ষেত্রে নারী বা পুরুষ কেউ কারও বাবা মাকে ছোট করে না দেখে বরং সমান গুরুত্বসহ দেখা উচিত, এটাই ইসলাম সম্মত। তবে নিজ পিতা-মাতার ভরণ-পোষণ করা প্রত্যেক সন্তানের জন্য জরুরী। বিশেষ করে ছেলেদের জন্য।
মহিম তালুকদার, খুলনা
প্রশ্ন-২৪. ডিসের ব্যবসা কি গুনাহের কাজ?
উত্তর: ডিস আসলে একটি প্রযুক্তি। এটি খারাপ নয়। এর মাধ্যমে যদি ইসলামি অনুষ্ঠান, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান শালীন অনুষ্ঠান দেখানো হয় তাহলে সেটি হবে সওয়াবের কাজ। আর যদি অশালীন, নাচ-গান, অনৈসলামিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি দেখানো হয় সেটা হবে গুনাহের কাজ।

প্রশ্ন-২৫. যাকাত পরিমাণ অর্থের চাইতে ঋণের পরিমাণ বেশি থাকলে কি যাকাত দিতে হবে?
উত্তর: জ্বি না, ঋণগ্রস্থ থাকলে যাকাত দিতে হবে না। তবে ঋণগ্রস্থ অবস্থায় বেশিদিন থাকাও যাবে না। যতশীঘ্র সম্ভব ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-২৬. কাজী মৌলভী ছাড়া সাক্ষি ছাড়া কেবল দুইজন ছেলে মেয়ে ৩ বার কবুল পড়ে বিয়ে করলে কি জায়েজ হবে?
উত্তর: জ্বি না, দুইজন সাক্ষি ছাড়া মহরানা নির্ধারণ ছাড়া উভয়ে কবুল বললেও বিয়ে বৈধ হবে না। মেয়ে বালেগ না হলে অভিভাবকও লাগবে।

প্রশ্ন-২৭. অনেকেই সেহরীর সময় আজান শুরু হওয়ার সাথে সাথেই এক গ্লাস পানি খেয়ে নেন। এতে কি রোযা হবে?
উত্তর: জ্বি না, আজান শুরু হওয়ার পরে আর কোন কিছুই খাওয়া যাবে না। তবে খাওয়া শুরু করার পরে যদি আজান শুরু হয় তাহলে খাওয়া শেষ করতে যতটুকু সময় লাগে ততটুকু সময় নেওয়া যাবে।

প্রশ্ন-২৮. পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শোয়া যাবে কি? এতে কি গুনাহ হবে?
উত্তর: জ্বি না, পশ্চিম দিকে পা দিয়ে শুলে তাতে গুনাহ হবে না। তবে যদি কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে ক্বাবাকে অসম্মান করার নিয়তে পশ্চিম দিকে পা দিয়ে ঘুমায় তাহলে গুনাহ হবে।

প্রশ্ন-২৯. আছর এবং মাগরিবের মধ্যবর্তী সময়ে কোন সেজদা করা যাবে না কথাটি কি কোরআন হাদীস সম্মত?
উত্তর: এই সময়ের মধ্যে তেলাওয়াতের সেজদা করা যেতে পারে। তবে কোন সুন্নত বা নফল নামাজ এই সময়ের মধ্যে পড়া হয় না।

আফসার উদ্দিন, ঢাকা

প্রশ্ন-৩০. শুক্রবারে জুমার নামাজের পূর্বে গোসল করার কি কোন বিশেষ ফজিলত আছে?
উত্তর: জুমার দিনে গোসল করা সুন্নত এবং ফজিলতপূর্ণ। তবে কোরআন হাদিসে সুনির্দিষ্ট সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি। গোসল করে জুমার নামাজ আদায় করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

প্রশ্ন-৩১. জন্মদিন পালন করা কি না জায়েজ?
উত্তর: জন্মদিন অনুষ্ঠান ইসলামি কালচারে নেই। রাসূল (স.) এবং তাঁর সাহাবীগণ কখনই কোন জন্মদিন পালন করেননি। তাই এটি করা যাবে না। এর পরিবর্তে যে কোন দিন আত্মীয়-স্বজন প্রতিবেশী এমনকি ফকির মিসকিন দাওয়াত করে তাদের খাওয়াতে পারেন এবং দোয়ার অনুষ্ঠান করতে পারেন।

প্রশ্ন-৩২. ৭০ বছরের কোন লোকও যদি (যে কোনদিন নামাজ পড়েনি) তওবা করে নামাজ পড়া শুরু করে তিনি কি ক্ষমা পাবেন?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, তিনি যদি তওবা করে অনুতপ্ত হয়ে নামাজ শুরু করেন এবং আর কোনদিন নামাজ থেকে বিরত না থাকার প্রতিজ্ঞা করেন তাহলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাকে মাফ করে দিতে পারেন।

প্রশ্ন-৩৩. পুরুষ মাথায় কালো কলপ বা অন্য কোন রঙ লাগাতে পারবে কি?
উত্তর: কালো রঙ বা কলপ ব্যতিত অন্য রঙ লাগানো যাবে। মেহেদী লাগানো যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৪. শারীরিক অসুস্থতার কারণে তাবীজ ব্যবহার করা যাবে কি?
উত্তর: জ্বি না, তাবিজ ব্যবহার করা যাবে না। আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন এবং আল্লাহর কাছে রোগমুক্তি কামনা করতে হবে।

হাসিনা আক্তার, ঢাকা
প্রশ্ন-৩৫. পাতলা ওড়না পরে নামাজ পড়া যাবে কি?
উত্তর: জ্বি না, যে ওড়নার ভেতর দিয়ে শরীর দেখা যায় এমন পাতলা ওড়না পরে নামাজ পড়া যাবে না।

প্রশ্ন-৩৬. অনেক সময় বসে বসে সুন্নত নামাজ পড়ি এতে কি নামাজ হবে?
উত্তর: যদি দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে অক্ষম হন তাহলেই কেবল বসে নামাজ পড়তে পারবেন। বিনা ওজরে বসে নামাজ পড়া যাবে না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-৩৭. অমুসলিমদের অধীনে চাকুরি করা কি বৈধ? ইসলামের আলোকে জানতে চাই।
উত্তর: অমুসলিমদের চাকুরি করা অবৈধ নয়। কাজটি যদি হারাম না হয় না জায়েজ না হয় তাহলে শরিয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে সেটি করা যেতে পারে।

প্রশ্ন-৩৮. মৃত ব্যক্তির আত্মা কি জীবিতদের কোন উপকার করতে পারে?
উত্তর: জ্বি না, কোন অবস্থাতেই মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের উপকার করতে পারে না। বরং জীবিত লোক মৃত ব্যক্তির জন্য দোয়ার মাধ্যমে উপকার করতে পারে।

প্রশ্ন-৩৯. রুকু বা সেজদায় গিয়ে বাবা মা'র জন্য দোয়া করা যাবে কি?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ করা যাবে। রাসূল (স:) রুকুতে এবং সেজদায় নির্দিষ্ট দোয়ার পাশাপাশি অন্য দোয়াও করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-৪০. হজ্ব করলে কি বান্দার হক নষ্ট করার গুনাহও মাফ করে দেন আল্লাহ?
উত্তর: হজ্ব করলে আল্লাহর হক নষ্ট করার মত গুনাহ আল্লাহ মাফ করে দিবেন। বান্দার হক নষ্ট করলে ঐ বান্দার নিকট থেকেই মাফ চেয়ে নিতে হবে। যদি তিনি মাফ করে দেন তাহলে আল্লাহও মাফ করে দিবেন। নইলে আল্লাহও মাফ করবেন না।

প্রশ্ন-৪১. অনেক অফিসার সরাসরি ঘুষ না নিয়ে অন্যের মাধ্যমে নেন। আবার দুজনে ভাগাভাগিও করেন ঐ টাকা। এরা দু'জনেই কি গুনাহগার হবে?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, এরা দু'জনেই গুনাহগার হবেন। ঘুষের সাথে জড়িত থাকলেই গুনাহগার হবেন, এটাই ইসলামের বিধান।

প্রশ্ন-৪২. বদলি হজ্ব কোন লোককে দিয়ে করাতে হয় জানালে উপকৃত হবো।
উত্তর: বদলি হজ্ব করানোর নিয়ম হচ্ছে পূর্বে হজ্ব করেছেন এমন কাউকে দিয়ে বদলি হজ্ব করাতে হবে। যদি কারও উপরে হজ্ব ফরজ হওয়ার পরেও শারীরিক বা অন্য কোন কারণে হজ্ব করতে পারেননি এমন লোক তার অর্থ দিয়ে বদলি হজ্ব করাবেন।

আসমা আক্তার, চট্টগ্রাম
প্রশ্ন-৪৩. স্ত্রী যদি স্বামীকে কষ্ট দেয় তাহলে স্ত্রীর গুনাহ হয় কিন্তু স্বামী যদি স্ত্রীকে কষ্ট দেয় তাহলে কি স্বামীর গুনাহ হবে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান কি সমান?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, স্বামী স্ত্রী উভয়ের ক্ষেত্রেই ইসলামের বিধান একই সমান। মর্যাদার ক্ষেত্রে ইসলামে নারী-পুরুষ উভয়ই সমান। আদম সন্তান নারী-পুরুষ সকলকেই আল্লাহ সম্মানিত করেছেন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
প্রশ্ন-৪৪. আমার মা অনেক অসুস্থ। এ অবস্থায় আব্বা চিল্লায় গেলে আমরা অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হই। এমতাবস্থায় আব্বা চিল্লায় না গেলে কি তার গুনাহ হবে?
উত্তর: ইসলামের দাওয়াতী কাজ করা অবশ্যই সওয়াবের কাজ। তবে আপনার মাকে অসুস্থ অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলে তার হক নষ্ট করা হবে। আর চিল্লায় যাবার সওয়াবের চাইতে পরিবারের হক নষ্ট করার গুনাহ কিছুটা হলেও বেশী হবে। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন-৪৫. হাউস বিল্ডিং থেকে লোন নিয়ে বাড়ি করা কি জায়েজ?
উত্তর: দেখুন হাউস বিল্ডিং বলে কোন কথা নেই। যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকেই যদি আপনি সুদের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ করেন সেটা নাজায়েজ। শরিয়ত সম্মত জায়েজ পন্থা হচ্ছে সুদবিহীন ঋণ গ্রহণ করা। ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী পরিচালিত যে কোন প্রতিষ্ঠান থেকে আপনি ঋণ নিয়ে বাড়ি করতে পারেন।

প্রশ্ন-৪৬. কোরবানীর পশু জবাই করার সময় কি জোরে জোরে শব্দ করে কোরবানীর দাতার নাম ও পিতার নাম উচ্চারণ করতে হবে?
উত্তর: যদিও এ নিয়মটি আমাদের দেশে চালু আছে কিন্তু কোরআন হাদিসে এ ধরনের কোন নিয়মের কথা উল্লেখ নেই। বরং একাজটি করা মোটেই ঠিক নয়।

ইয়াসমিন হক, রাজশাহী
প্রশ্ন-৪৭. মহিলারা কতটুকু শব্দ করে নামাজ আদায় করবে?
উত্তর: নিয়ম হলো মহিলারা একেবারেই শব্দ না করে নামাজ আদায় করবে।
প্রশ্ন-৪৮. সেহরীর শেষ সময়ে আজানের পূর্বে কি টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত ব্রাশ করা যাবে?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, ব্রাশ করা যাবে। তবে উত্তম হলো সেহরীর শেষ সময়ের পূর্বেই ব্রাশ করা।
প্রশ্ন-৪৯. ফিতরা কি রমযানের মধ্যে আদায় করা যাবে?
উত্তর: জ্বি হ্যাঁ, ফিতরা রমজানের মধ্যেও আদায় করা যাবে। তবে ঈদের দিন সকালেই ফিতরা আদায় করা উত্তম।

অনুলিখন : এস. এম. ফায়ছাল আযাদ